আনন্দমেলা

৪ জুন ১৯৮০ • আনন্দবাজার-প্রকাশন •

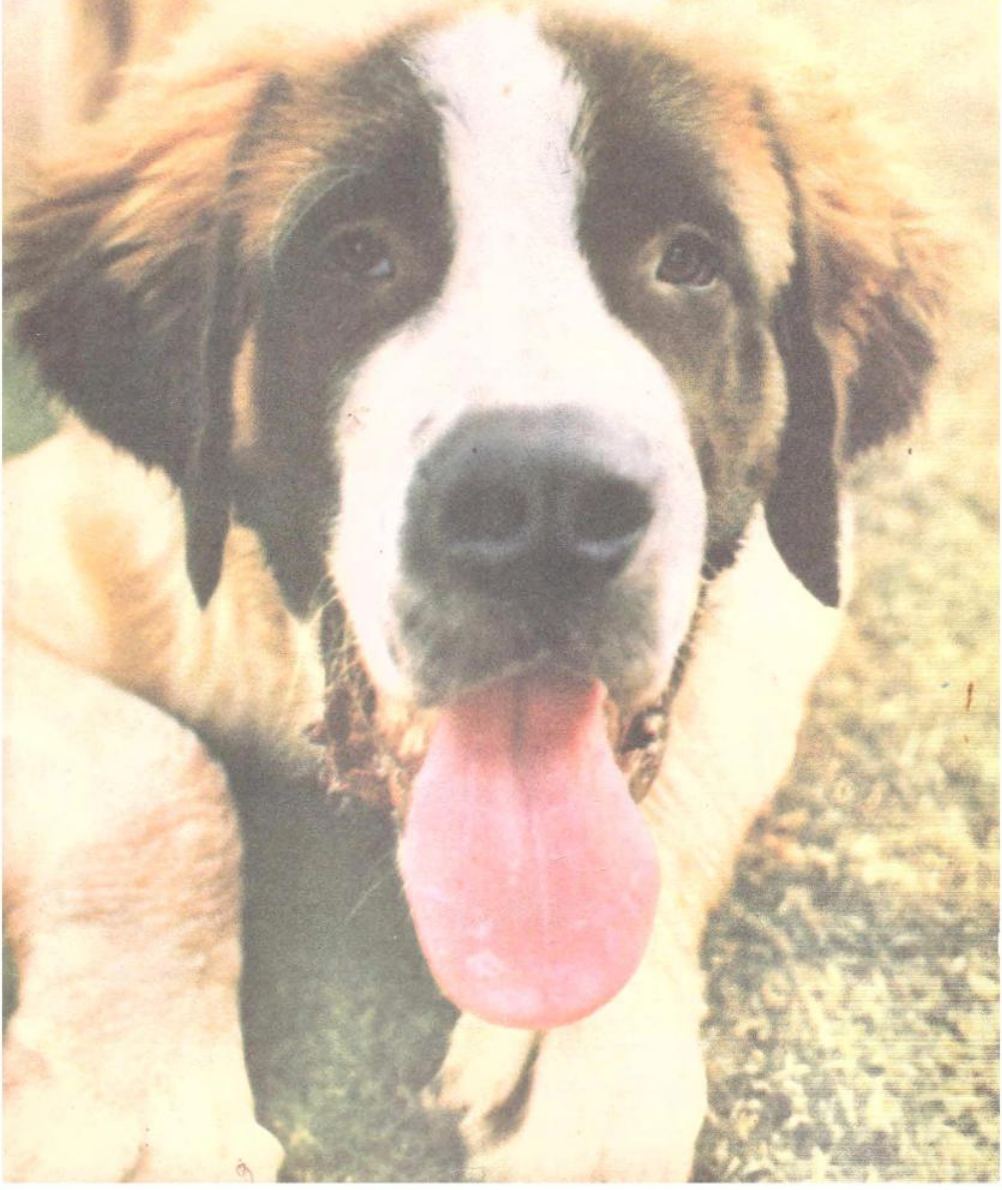

বেশির ভাগ মায়েরা
নিজেদের সন্তান পুষ্টিকর খাদ্য
খাচ্ছে কিনা সেবিষয়ে
চিন্তিত থাকেন।
কিন্তু সুচিত্রা তা' নন ...

"কারণ, আমি ওদের রোজই হরলিক্স খাওয়াই।
ডাক্তারবাবু যেদিন থেকে হরলিক্স সুপারিশ করেছেন,
আমি আমার ছেলেমেয়েদের হরলিক্স খাওয়া
প্রতিদিনের অভ্যাস করিয়ে নিয়েছি। আমি জানি,
হরলিক্স ওদের শক্তিসমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যবান রাখতে
সাহায্য করে।

আপনি আপনার ছেলেমেয়েদের
নিয়মিত হরলিক্স খাওয়ান তো?"

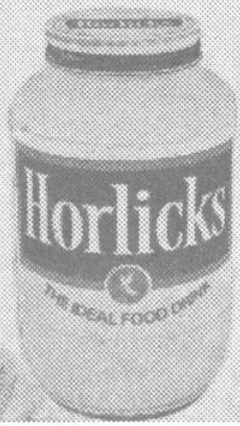

"হরলিক্স পুষ্টির একটি মূল উৎস। পুষ্টিকর খাদ্যের এক অপূর্ব্ব সামিশ্রণে তৈরী হরলিক্স স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি সর্বদাই হরলিক্স ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

Hx-6282 Ben-2

হরলিক্স
মহান শক্তিদাতা

আনন্দমেলা

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ • ৪ জুন ১৯৮০ • ৬ বর্ষ • ৪ সংখ্যা

ভ্রমণ-কাহিনী
হংকংয়ের গল্প। কৃষ্ণা বসু ৪
স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১০
উপন্যাস
পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
কে। বিমল মিত্র ৩৭
গল্প
বাবার স্কুলে-যাওয়া। শেখর বসু ১২
ক্যামেরায় ধরা। শ্রীধর সেনাপতি ১৭
বোম্বেটের বাড়ি। মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় ৩২
প্রোটনিয়ার হিপনোটিজ্‌ম। শান্তনু ভট্টাচার্য ৪২
সেয়ানে সেয়ানে। আরতি দাস ৪৪
ছড়া
টুকুর ভাবনা। শ্যামলকান্তি দাশ ১৯
অঙ্ক-পাখি। রতনতনু ঘাটী ১৯
যাচ্ছেটা কে। অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ৪৬
চিত্রকাহিনী ও কমিকস
সদাশিব ২০, রোভার্সের রয় ২২, টিনটিন ২৪
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩
খেলাধুলো
পায়াস বাংলাকে ভালবেসেছে। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫০
ওরা একুশজন। মণীশ মৌলিক ৫১
গোলের লড়াই। অশোক দাশগুপ্ত ৫৩
এশীয় টেবিল টেনিস। অলোক দাশগুপ্ত ৫৭
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৪৬
তোমাদের পাতা ৪৭,
সবচেয়ে বড় ফুল। পার্থসারথি চক্রবর্তী ৬২
মণিমেলার খবর ৬২, আঁকো-শেখো ৬৬
পায়াসের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪৯

প্রচ্ছদ বিপুল গুহ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

তোমাদের জন্য এখন
আমাদের
তিন
তিনটি

চিলড্রেন্স
কাউণ্টার

রিচি রোড শাখা ঃ
১৭/২ রিচি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯

গড়িয়া শাখা ঃ
১২০/এ রাজা এস সি মল্লিক রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৪৭

গড়িয়াহাট শাখা ঃ
১এ, ম্যাঙেভিলা গার্ডেনস কলিকাতা-৭০০ ০১৯
(প্রবেশপথ গড়িয়াহাট রোড)

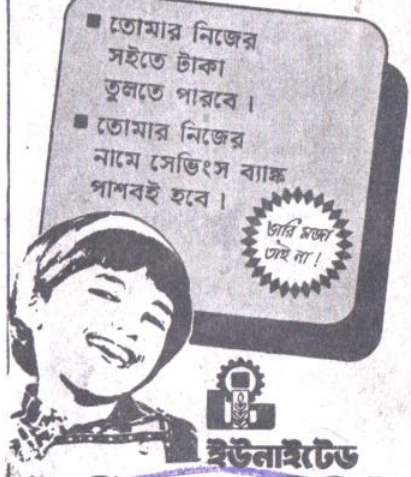

ইউনাইটেড
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস ঃ ১৭, আর এন মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান ঃ জে এন বিশ্বাস

Progressive—UIB74/80

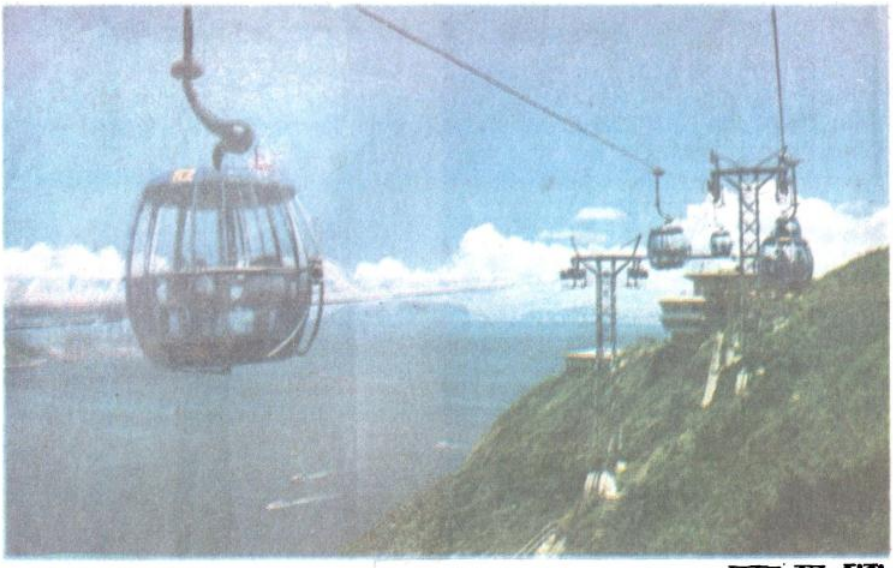

কেব্‌ল কার, হংকং

হংকংয়ের গল্প

কৃষ্ণা বসু

সত্যি কথা বলতে কি, হংকং যাবার আমার বিশেষ কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমার ধারণা ছিল হংকং ফ্রী পোর্ট, অবাধ ব্যবসাবাণিজ্যের জায়গা। সেখানে যায় কারা? যারা সস্তায় কেনাকাটা করতে চায়, ব্যবসা করে লক্ষ্মীর কৃপালাভ করা যাদের বাসনা—তারাই। আর নয়তো গল্পের বইতে যেসব দুর্ধর্ষ স্মাগলারদের কথা আমরা পড়ি সেইসব রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়করাও হংকংয়ের অলিগলিতে ঘুরে বেড়ায়। আশ্চর্য, কেউ আমাকে আগে

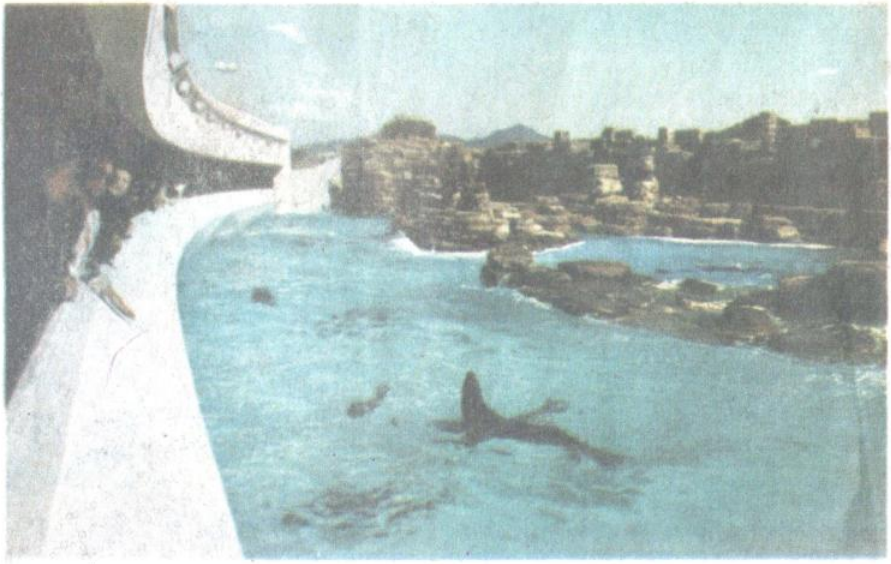

ওয়েভ কোভ্

বলেনি হংকং কত সুন্দর শহর, কত কবিত্বময় এর রূপ। নীল সমুদ্রের কোলে এই উপনিবেশ। সোজা সমুদ্র থেকে যেন উঠে গেছে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। আর সে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গড়ে উঠেছে ত্রিশতলা, চল্লিশতলা বিরাট সব অট্টালিকা। পাহাড়ে-সমুদ্রে মিলে প্রকৃতির নিজের হাতে ছোঁয়া সৌন্দর্য আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আধুনিক মানুষের হাতে গড়া সোজা-সোজা, খাড়া-খাড়া স্থাপত্য শিল্পের নমুনা।

মিউজিয়ামে কিউরিও দেখার মতো হতে পারে।

কিন্তু হংকংয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখাতেই বন্ধুতা। মনে হল, শুধু হংকংয়ের জন্যই হংকং আসা যায়। আর যে হংকংয়ের স্মৃতি আমার রয়ে গেছে, তাতে আছে নীল সমুদ্র, মস্ত-মস্ত পাহাড়ের গায়ে আরো মস্ত-মস্ত প্রাসাদ, আর বেশ কিছু রঙিন মাছ, ডলফিন, সী লায়ন, তিমি প্রভৃতি জলচর জীব।

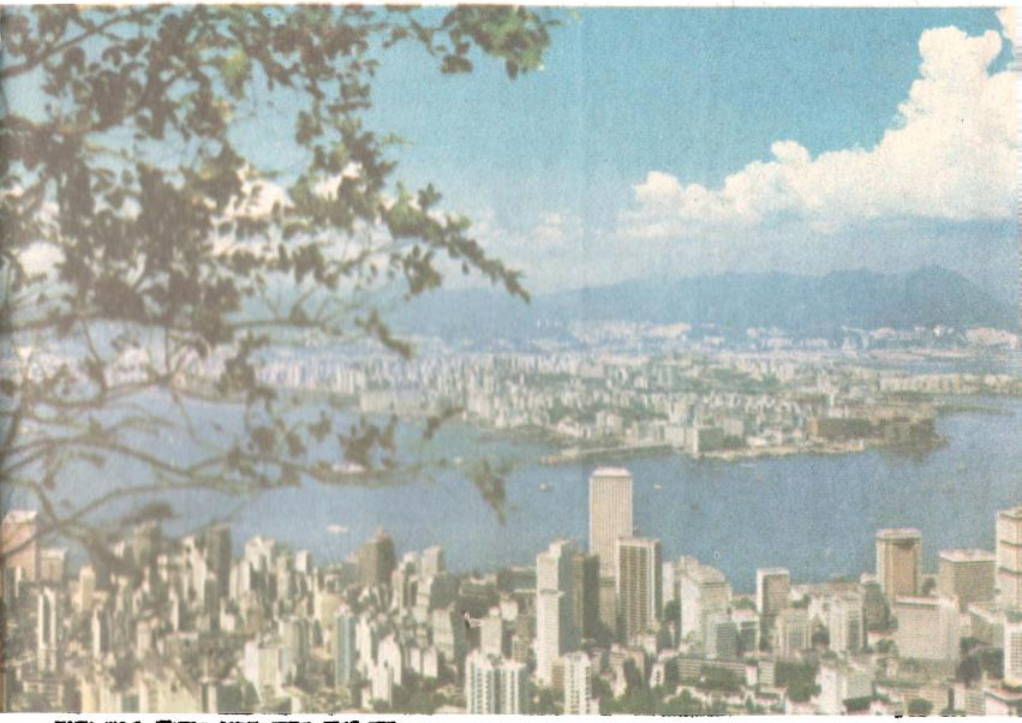

হংকং শহর, আকাশ থেকে যেমন দেখা যায়

পরে তাই ভেবেছি, ভাগ্যিস, হংকং আমাদের সফরসূচী থেকে বাদ দিয়ে দিইনি। তখন হংকং যাবার দুটো কারণ মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম। এক, সেখানে আমাদের দুজন বিশেষ বন্ধু থাকে, তাদের নাম অলি আর হিলি। খুব মজার নাম, না? আর দু নম্বর কারণ, এককালে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না সেই অধুনা হারিয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যের এক টুকরো রয়ে গেছে হংকং-এ। তাই হংকং দেখাটা অনেকটা

হংকংয়ের এরোড্রোম যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল। আকাশের ওপর থেকে নীচের দিকে চাইলে চোখে পড়ে নীল সমুদ্র কার্পেটের মতো পড়ে আছে। মনে হয়, এই বুঝি এরোপ্লেন তার ওপরেই নেমে পড়বে। কিন্তু না, বেশ শক্ত মাটিতেই এরোপ্লেন এসে নামল। হংকংয়ের বিমানবন্দর গমগম করছে। একসঙ্গে দুটো আন্তর্জাতিক প্লেন নামল। পাসপোর্ট চেকিং ও কাস্টমস্-এ ধাক্কাধাক্কি ব্যাপার!

আমি প্রথমে ভেবে পাচ্ছিলাম না, নিজেকে কেন এত গ্রাম্য লাগছে। যেন মফস্বল থেকে সদ্য শহরে এসেছি। কাস্টমস অফিসার বাক্স-প্যাঁটরা ঘেঁটে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, "ফায়ার-আর্মস আছে?"

ফায়ার-আর্মস?

শোনো কথা, আমাকে দেখলে কি মনে হয় বন্দুক-পিস্তল নিয়ে ঘুরছি।

"তবে কী আছে? ইণ্ডিয়া থেকে আসছ? গাঁজা আছে? গাঁজা কিংবা চরস?"

হতাশ হতে হল অফিসারকে। ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি কেন এত বোকা-বোকা লাগছে নিজেকে। আর কিছু নয়, আলো। আলোয় আলোময় হয়ে আছে হংকং শহর। আমি তো কলকাতায় থাকি। সেখানে লণ্ঠন, হ্যারিকেন, মোমবাতির পর এত আলো আমার সহ্য হচ্ছিল না। এই তো কেমন মৃদু মোমবাতির আলোয় হংকংয়ের গল্প লিখছি বসে। কিন্তু সেদিন রাতদুপুরে হংকংয়ের পথেঘাটে যেন দিনের আলো, এমনি রোশনাই।

গাড়ি চালাতে চালাতে হিলি বুঝিয়ে দিচ্ছে এই বাড়িটার নাম এই, এই রাস্তার নাম এই। হংকং আর কোওলুন দুটো দ্বীপ নিয়ে হংকং। বিমানবন্দর কোওলুনে, আর থামিয়া চলেছি হংকংয়ের অপর প্রান্তে। প্রথম

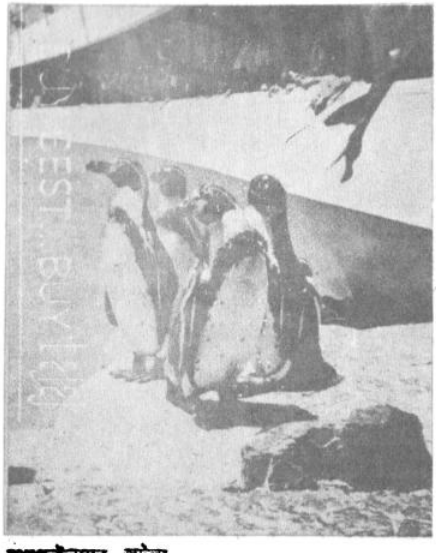

পেঙ্গুইনদের জটলা

রাত্রেই প্রায় সারা শহর মোটরে ঘোরা হয়ে গেল।

তবে, গভীর রাত্রে ঘুরছিলাম বলে কোনো অসুবিধা হল না। নয়তো দিনের বেলা হংকং শহরে ট্র্যাফিকের যে জ্যাম দেখলাম তা ভয়াবহ। হংকংয়ে আমাদের বাড়িতে যে ছোট ছেলেটি ছিল তার নাম গাগ্‌গু। সে ভোর ছটা বাজতে না বাজতে পিঠে ইস্কুলের ব্যাগ ঝুলিয়ে রওনা হয়ে যায়। আমি তখনো বেড-টীতে চুমুক দিইনি। যদি কোনো কারণে সাতটা বেজে যায় তাহলে যাকে বলে বাম্পার-টু-বাম্পার ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে যাবে। হংকংয়ের রাস্তা সরু, প্রায় দার্জিলিঙের মতো ঘুরে ঘুরে উঠেছে আর নেমেছে। গায়ে-গায়ে লেগে যাওয়া মোটর গাড়ি, মিনিবাস সব মিলে লম্বা লাইন শামুকের মতো ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। তাই যদিও ইস্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ন'টা, সাড়ে ন'টার আগে খুলবে না, তবুও সকাল ছ'টা বাজতে না বাজতে যে যার কর্মস্থলে দৌড় লাগায়। গাগ্‌গুর মতো ছোট ছেলেরা দুপুরে খেতে বাড়ি আসে না, ইস্কুলের ছুটির পরেও আসে না, খেলাধুলো যা করবার সব একসঙ্গে সেরে নিতে হবে। গাগ্‌গু কুংফুর ক্লাস শেষ করে রাত আটটায় বাড়িতে ফেরে।

তাই বলে হংকংয়ের ছেলেমেয়েরা কষ্টে আছে—এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। হংকং শহরে রয়েছে এশিয়ার সুবৃহৎ সমুদ্র পার্ক। রবিবার ও ছুটির দিনে লোক ভেঙে পড়ে সেখানে। হংকংয়ের অধিবাসীরা বেশিরভাগ চীন দেশের। চীনারা ছুটির দিনে সপরিবারে বেড়াতে বা পিকনিক করতে খুব ভালবাসে। অবশ্য অনেক সময় ওরা যায় বাপ-ঠাকুর্দার সমাধিস্থানে। ওরা সমাধিতে ফুল দেয় তারপর কাছাকাছি কোথাও পিকনিক করে। আমরা যেমন জীবিত আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাই, ওরাও হয়তো তেমনি ওদের পিতৃপুরুষের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে সবাই যায় হংকংয়ের রিপালস্ বে—যেখানে আছে লম্বা টানা সমুদ্র-বেলা, আর নয়তা ভিক্টোরিয়া পিক-এ অর্থাৎ হংকংয়ের সব চাইতে উঁচু পয়েন্টে।

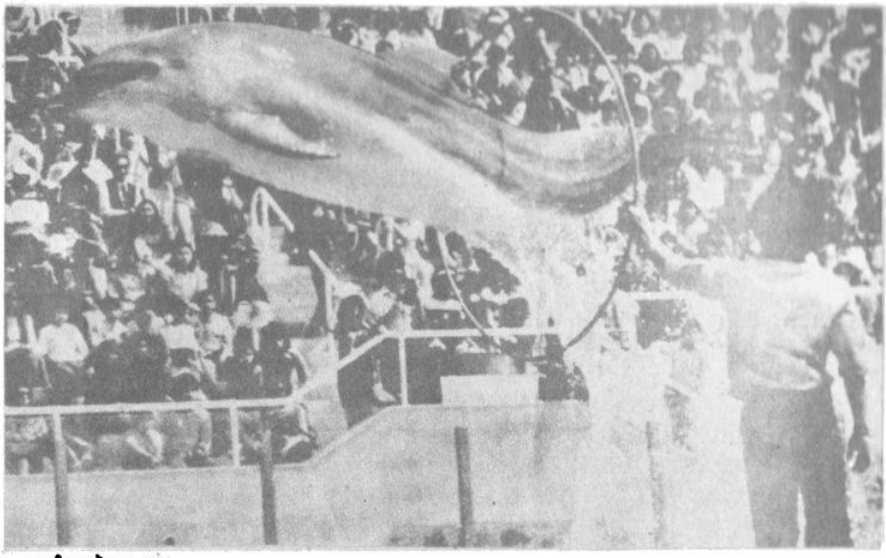

সমুদ্র-থিয়েটারে শো

ফুনিকুলার বা ছোট্ট ট্রেনে চড়ে সেখানে উঠে যাওয়া যায়। ওপরে আছে বসার জায়গা, রেস্তোরাঁ, দোকানপাট। আমরা অবশ্য গাড়িতে করে ওপরে গেলাম। নীচের দিকে চেয়ে সমুদ্রে ঘেরা হংকং শহর চমৎকার দেখাল। পিকে নাকি অনেকসময় ঘন কুয়াশা থাকে। তাই সব সময় এত সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় না। সবাই বললে, আমাদের ভাগ্য খুব ভাল। ঝলমল করছে রোদ্দুর, নীল আকাশ। নীচে প্রতিটি বাড়িঘর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য আমরা উনত্রিশ তলায় যে-ফ্ল্যাটে থাকতাম, সেখান থেকেও হংকংয়ের দৃশ্য খুব সুন্দর। বারান্দায় বসলে সোজা নীচে দেখা যায় সমুদ্র। হঠাৎ মনে হয়, জাহাজের ডেকে বসে আছি। নীচে জাহাজ আর নৌকোগুলো দেখায় খুব ছোট-ছোট। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম একজন ইংরেজ কবি ডোভার বীচের বর্ণনা দিতে গিয়ে নীচের জাহাজগুলোকে বলেছেন, শস্যের দানা যেন জলে ভাসছে। আগে ভাবতাম, এ-ছবিটা কবি কেমন যেন এঁকেছেন, কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখলাম, বর্ণনাটা কত সত্যি।

আমাদের আবহাওয়া-ভাগ্য খুবই ভাল ছিল। যেদিন সমুদ্র-পার্ক দেখতে গেলাম সেদিনও বেড়াতে যাবার পক্ষে চমৎকার দিন। এই পার্ক মাত্র বছর তিনেক হল গড়ে উঠেছে। একটা বিরাট পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত এই পার্ক। পাহাড়ের নীচে কেব্‌ল-কার বা চেয়ার-কারের স্টেশন। সেখান থেকে বেশ সুন্দর চেয়ার-কারে চেপে বসলাম। সুইজারল্যাণ্ডে বা আমাদের ঘরের কাছে কাশ্মীরে যে চেয়ার-কারে চড়েছি তা হল হাতলওয়ালা খোলা চেয়ার রোপওয়ে দিয়ে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু এখানকার চেয়ারগুলো খুবই সুদৃশ্য, গোল করে ঘরের মতো তৈরি। ছ'জন বসতে পারে। ধীরে ধীরে চেয়ার-কার উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র। নীচে সমুদ্রের দিকে চাইলে একটুও যে বুক কাঁপছে না, তা নয়। হঠাৎ যদি ওপরের তারটা ছিঁড়ে—। যাকগে, ওসব না ভাবাই ভাল। আমাদের এক লাইন চেয়ার ওপরে উঠছে আর অন্য লাইনে সবাই নামছে। পরস্পর হাত নাড়তে নাড়তে পাহাড়ের ওপর চেয়ার-কার স্টেশনে এসে চেয়ার থামল।

ঘড়ির দিকে চেয়ে তখনি আমরা দৌড় দিলাম সমুদ্র-থিয়েটারের দিকে। কারণ, থিয়েটারের শো এখনই শুরু হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর বিশেষ বিশেষ সময়ে এই শো শুরু হয়। বিরাট স্টেডিয়াম,

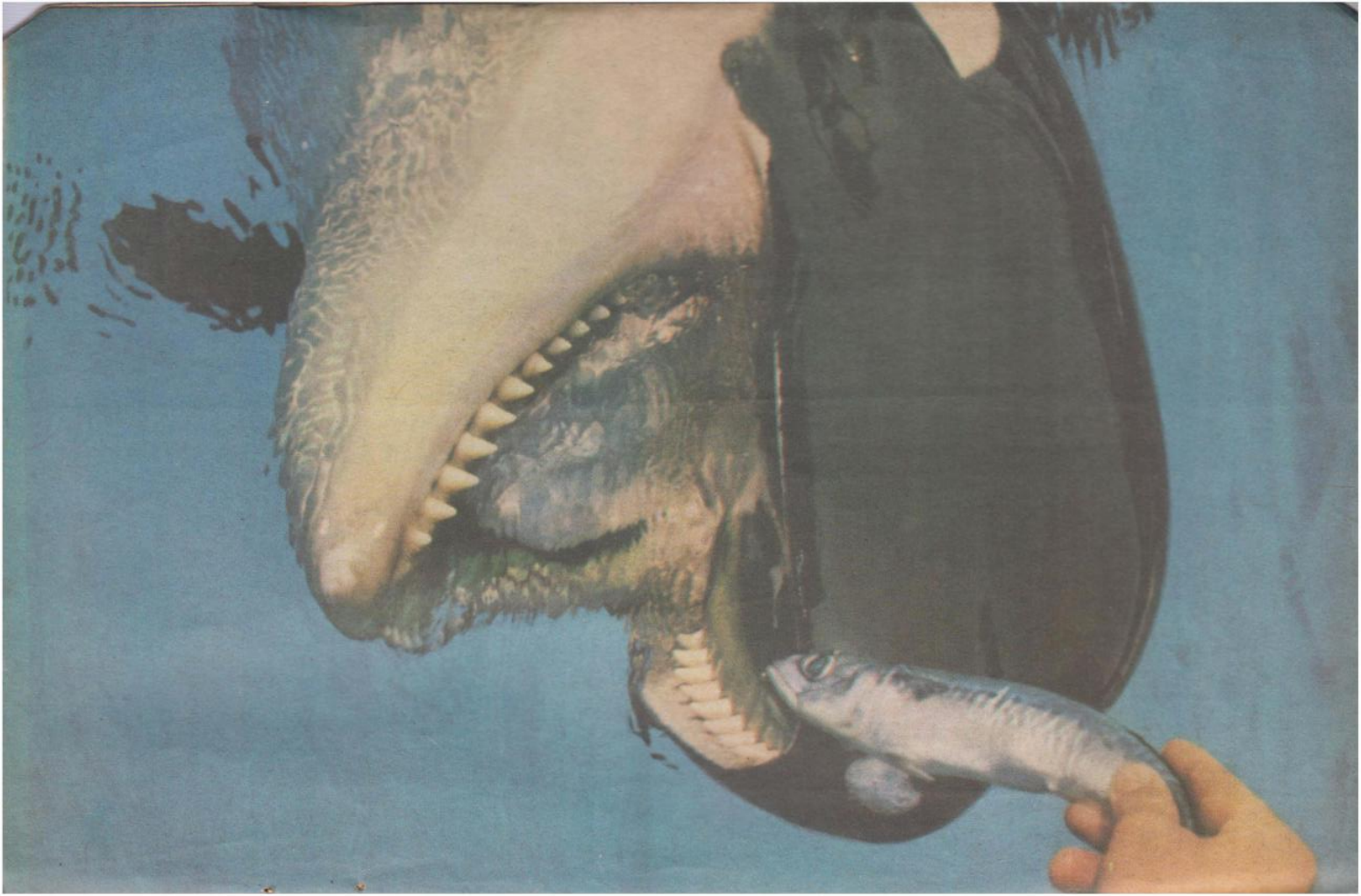

আধখানা চাঁদের মতো আকার। তার অন্যদিকে জলে খেলা দেখাচ্ছে সী লায়ন, ডলফিন বা শুশুক আর সীল মাছ। ওদের যারা ট্রেনার তারা একটা দ্বীপের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের পিছনে দিগন্ত জুড়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্র। চোখ জুড়িয়ে যাওয়া দৃশ্য! দর্শকের আসনে মোটের ওপর বেশ ভিড়। হাজার-চারেক লোক একসঙ্গে বসতে পারে। আমরা তাড়াতাড়ি জায়গা খুঁজে বসে পড়লাম।

মস্ত বড় মালা হাতে নিয়ে ট্রেনাররা দাঁড়িয়ে আছে। দুদিক থেকে দুটো সী লায়ন জল থেকে সোঁ করে উঠে এসে মালার মধ্য দিয়ে গলে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল। অন্যদিকে ডলফিনরা হাইজাম্প দিচ্ছে। কয়েকটি ডলফিন আমরা যাকে হার্ডল রেস বা অবস্টাকল রেস বলি তাতে অংশ নিচ্ছে। নানারকম উঁচু-নিচু বাধা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে—সবকিছু পার হয়ে ডলফিনরা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ওদের অদ্ভুত দেহে এত সুন্দর নাচের ছন্দ আছে কে জানত! মনে হয় যেন ব্যালে নাচ দেখাচ্ছে। ট্রেনার আঙুল তুলে কী বলছে, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম খেলা দেখাবার জন্যে তারা তৈরি। আবার গানও শোনাল। এক লাইনে দাঁড়িয়ে কোরাস। আওয়াজটা খুব মধুর হল বলা যাবে না। এক-একটা খেলা শেষ করে কেমন হ্যান্ড শেক করছে ট্রেনারের সঙ্গে। দুদিকে রঙিন প্লাস্টিকের বালতিতে অনেক ছোট ছোট মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে। এক একটা খেলা শেষে সী লায়ন আর ডলফিনের দল পিছলে চলে যাচ্ছে মেয়ে দুটির কাছে, আর গিয়েই মুখ হাঁ করছে। গালে পান ফেলার মতো টুকটুক করে মুখে মাছ ফেলে দিচ্ছে মেয়েরা। খুব খুশি হয়ে পরের খেলা দেখাতে চলে আসছে তারা।

আবার একটা বিরাট তিমিও আছে। তার নাম কিলার হোয়েল—বা হত্যাকারী তিমি। ওরকম বিশ্রী নাম কেন কে জানে! ট্রেনারের নির্দেশে খেলা দেখাচ্ছিল সুবোধ বালকের মতো। খেলা দেখানো শেষ হলে ট্রেনারকে পুচ্‌পুচ্‌ করে চুমু খেল। তারপর ট্রেনারকে পিঠে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলে গেল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

এটল রীফ মাছ

ডলফিনরা হাইজাম্প দিচ্ছে

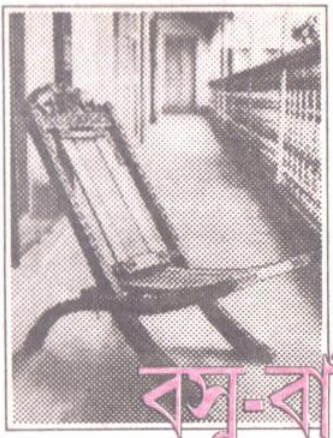

শিশিরকুমার বসু

॥ ২ ॥

বাড়ির ছোটরা দাদাভাইকে একান্তভাবে পেতাম, যখন তিনি আমাদের সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। তাঁর যখন বছর চল্লিশেক বয়স, তখন তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকে তিনি শরীরের দিক থেকে ডাক্তারের পরামর্শমতো কড়া নিয়ম মেনে চলতেন।

নিয়মের মধ্যে প্রধান দুটি ছিল সকালে হেঁটে বেড়ানো এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সংযম। দাদাভাই জীবনের তিরিশ বছর নুন না খেয়ে চালিয়ে গেছেন। কী দিয়ে রান্না হবে, কী কী খাওয়া চলবে বা চলবে না, মা-জননী পাশে বসে তদারক করতেন, এবং প্রায়ই "লোভ"-এর কুফলের কথা দাদাভাইকে মনে করিয়ে দিতেন। মাঝে-মাঝে বলতেন, "তোমার তো খালি লোভ!" কথাটা শুনে আমাদের কেমন-কেমন লাগত। কারণ দাদা-ভাইয়ের লোভ বলে কিছু ছিল বলে তো কখনও মনে হয়নি।

আমার মা রান্নাবান্নায় বেশি আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু দাদাভাইয়ের জন্য মা-জননীর নির্দেশমতো ইক্‌মিক কুকারে রান্না চাপাতেন। উডবার্ন পার্কের বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় দাদাভাই মাটিতে আসন পেতে খেতে বসেছেন, এই দৃশ্যই বেশ মনে পড়ে। পাশেই টেবিল-চেয়ার, কিন্তু তিনি মাটিতে বসেই খেতেন। নিয়মমাফিক তাঁকে কইমাছ ঘিয়ে ভেজে খেতে হত।

ডাক্তারি দুরকমই চলত—অ্যালোপ্যাথি ও কবিরাজি। আমাদের নতুন কাকাবাবু সুনীলচন্দ্র নিজেই বড় ডাক্তার ছিলেন। বাড়ির কবিরাজ ছিলেন শ্যামাদাস বাচস্পতি। তাঁর স্নিগ্ধ সৌম্য চেহারা বেশ মনে পড়ে। আমাদের ডাক্তার-কাকা আর-একজনকে পরামর্শের জন্য প্রায়ই ডাকতেন, তিনি হলেন স্যার নীলরতন সরকার। যাঁরা একবার দুবার স্যার নীলরতনকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁকে ভুলবেন না। চেহারায় অপূর্ব দীপ্তি আচরণে সে কী মাধুর্য। তাঁর স্মিত হাসিটি দেখলেই রোগীর অসুখ অনেকটা সেরে যেত।

দাদাভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি কলকাতার ইডেন গার্ডেন, শিলংয়ের লেকে এবং পুরীর সমুদ্রের ধারে। আমার মা বিভাবতীকে দাদাভাই 'মা-জননী' বলে ডাকতেন। দাদাভাইয়ের ইচ্ছামতো প্রত্যেক-বার বেড়াতে বেরোবার আগে মা'র অনুমতি নিয়ে আসতে হত। অনেকবার এমন হয়েছে, দাদাভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, দাদাভাই জিজ্ঞেস করলেন, মা-জননীকে বলে এসেছি কিনা। না হলে ফিরে গিয়ে মার অনুমতি নিয়ে আসতে হত। মা অপ্রস্তুত হতেন। বলতেন দাদাভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাবে, আমাকে জিজ্ঞেস করবার কী আছে! দাদাভাইয়ের বেড়ানোর ধরন ছিল ছাতা মাথায় সহজ, ধীর মাপা গতি। কতটা বেড়ানো হবে তাও ঠিক করা আছে। বাবা বা রাঙা-কাকাবাবুর (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে বেড়ানো একেবারে ভিন্ন ব্যাপার। বাবার গতি মাঝা-মাঝি হলে ঢিলেমি চলবে না— সমান তালে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। রাঙা কাকাবাবুর সঙ্গে হাঁটা তো একটা লড়াই, সে কথা পরে বলব।

আগেই তো বলেছি, দাদাভাইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ছিল পুরোপুরি স্নেহের, শাসনের কোনও লেশমাত্র নেই। সেকালে তো বাড়িতে অনেক চাকরবাকর থাকত, তারাও কিন্তু তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল না।

একবার অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য দাদাভাই মা-জননীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের

উডবার্ন পার্কের বাড়িতে রয়েছেন। খুব পুরনো দুই ভৃত্য শেখ কালু ও মাগুনি দাদাভাইয়ের খুব সেবা করত, তাছাড়া বামুন-ঠাকুর তো আছেই। বিদায়ের সময় এলে দেখেছি তাদের হাত ধরে দাদাভাইয়ের কৃতজ্ঞতার কান্না। শেখ আমেদ আমাদের পুরনো ড্রাইভার, সে খুবই অস্বস্তি বোধ করত, যখন দাদাভাই তার কাঁধে হাত দিয়ে বন্ধুর মতো সম্ভাষণ করতেন, "আচ্ছা, আমেদ ভাই, কেমন আছ বলো তো!"

তোমরা যদি সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী 'ভারতপথিক' পড়ো, তাহলে দেখবে যে, তাঁরাও যখন ছোট্ ছিলেন, বাড়ির চাকর-বাকরদের তখন পরিবারভুক্ত মানুষ বলেই গণ্য করা হত।

১৯৩৩ সালে পুরীতে গিয়েছি মাকে সঙ্গে নিয়ে। সেকালে মেয়েরা একলা ঘোরাফেরা করতেন না, ট্রেনে যাত্রা তো নয়ই। আমি তখন নেহাতই বালক। আমাকে মা সঙ্গে নিলেন বোধহয় নিয়মরক্ষার জন্য। কারণ আমার চেয়ে বয়সে বড় কোনো পুরুষ বাড়িতে ছিলেন না। বাবা জেলে, দাদারা কেউ হাতের কাছে নেই। দাদাভাই তাঁর কথা-বার্তায় আমাকে মা'র ছোট্ট অভিভাবকের মর্যাদা দিতে লাগলেন এবং এমন সব আলোচনা করতে লাগলেন যেন আমি বেশ বড় হয়ে গিয়েছি। তিনি জেনেছিলেন আমি সংস্কৃত পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়েছি। মুখস্থ বিদ্যা আর কী! তিনি ধরে নিলেন যে, আমি অনেক সংস্কৃত শিখে ফেলেছি। বললেন, আমি যেন গীতা পড়তে আরম্ভ করি।

মা-জননী তো মোড়ায় বসে আমাকে খাওয়াতে বসতেন। নানারকম রান্না, বিশেষ করে মাছের ভিন্ন ভিন্ন পদ। আমি তখনও স্বল্পাহারী আর পেটরোগা। তাঁর নিজের ছেলেরা আমাদের বয়সে কত এবং কী কী খেত, মা-জননী তার একটা ফর্দ আমাকে রোজই শোনাতেন। আমি লজ্জার খাতিরে যতটা পারতাম খেতাম এবং পরে ভুগতাম। খাওয়ার ব্যাপারে, বিশেষ করে মাছ খাওয়ার ব্যাপারে, আমাদের এক আত্মীয় সম্বন্ধে একটা মজার গল্প সেইসময় শুনেছিলাম। সম্পর্কে তিনি আমাদের জ্যাঠামশাই।

দাদাভাই জানকীনাথ (১৯২১)

গল্প শুনেছি, প্রকাণ্ড একটা মাছ কিনে এনে তিনি নিজে তদারক করে কাটিয়ে কটা টুকরো হল গুনে আমার এক পিসিমাকে ভাজতে দিতেন। গুনে গুনে মাছ ভাজা খেয়ে এক কুঁজো জল খেয়ে, যাবার সময় বলতেন. "কই, মাছের তেলটা দে!"

আমি যখন খুবই ছোট, তখন দাদাভাই আমাকে একটা নাম দিয়েছিলেন জংবাহাদুর। আমার মতো এক লাজুক নির্বিরোধী ছেলেকে এরকম দুর্ধর্ষ নাম কেন দিয়ে ফেললেন, আমি জানি না। বোধহয় দার্জিলিং কার্শিয়াং আমাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে নেপালি নামটি তাঁর মনে ধরেছিল। বহুদিন পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাঞ্জাবে রাজবন্দী থাকার সময় এই নামটি আমি ব্যবহার করেছিলাম, পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। আমি লায়ালপুরের জেল থেকে ১৯৪৫-এ আমার মা'কে নানা খবর দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিসের চোখ এড়িয়ে একটি গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সেই চিঠিতে নিজেকে আমি জংবাহাদুর বলে উল্লেখ করেছিলাম। পুলিস তো এ-নামটি জানে না।—সুতরাং চিঠিটি ধরা পড়লেও কোনো বিপদ নেই। (ক্রমশ)

বাবার স্কুলে যাওয়া

শেখর বসু

অতনু দু'বছর কিন্ডারগার্টেনে পড়ার পরে এবার হাইস্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছে। স্কুলটা ভীষণ ভাল। যেমন বড় বাড়ি, তেমনি বড় খেলার মাঠ। স্কুলের নামটাও খুব বড়। ছোট্ট করে সবাই বলে এন বি এস।

স্কুলে প্রথমদিন এসেই অতনুর তিনজন বন্ধু হয়েছিল। পরদিন আরও পাঁচজন, তার পরদিন আরও চারজন। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে গোটা ক্লাসই ওর বন্ধু হয়ে গেল। কিন্তু আটদিনের দিন থেকেই সমস্যা দেখা দিল। তার জন্যে দায়ী ওর বাবা।

অতনুদের স্কুল বসে সকাল আটটায়। ওদের বাড়ি থেকে স্কুলে পৌঁছতে আধ-ঘন্টাটাক সময় লাগে। এতটা সময় লাগত না, কিন্তু বাস পালটাতে হয় যে দু'দুবার। বাস আসতে অনেক সময় আবার দেরি হয়, তার ওপর রাস্তার ভিড়। কিন্তু এইসব কারণের জন্য অতনুর স্কুলে পৌঁছতে দেরি হয়েছে মাত্র দু'একদিন। বেশিরভাগ দিন দেরি হয় ওর বাবার জন্যে।

বাবা কিছুতেই ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই অতনুর কাজ হল বাবাকে ধাক্কা দিয়ে বলা: ও বাবা ওঠো, ও বাবা ওঠো! কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। ধাক্কাধাক্কি, চেঁচামেচি করার ফাঁকে-ফাঁকে বাবা শুধু উ-আ করেন।

অতনুর মা ঘুম থেকে উঠেই চান করতে চলে যান। চান করে, চা তৈরি করে, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। তখন অতনুর বাবাকে ঘুম থেকে তোলার জন্য আর একবার চেষ্টা করা হয়।

চা যখন প্রায় ঠাণ্ডা জল হয়ে যায় তখন অতনুর বাবা বুকের নীচে বালিশ দিয়ে চোখ বুজে বুজে চা খান কোনোমতে। তারপর আরও কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াবার পরে উঠে বসে খবরের কাগজ টেনে নেন। প্রথম পৃষ্ঠাটা দেখার পরে বসে বসেই চিৎকার করেন, "আর এক কাপ চা দাও, আগের চাটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।"

অতনুর মা আগে কোনো কথা না বলেই আর এক কাপ চা এনে দিতেন। কিন্তু অতনুর কয়েকদিন স্কুলে পৌঁছতে দেরি হয়েছে বলে আজকাল বলেন, "চা পরে খেও, আগে তৈরি হয়ে নাও তো। নাহলে আজকেও ওর স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাবে।"

কিন্তু অতনুর মা যতই গজগজ করুন না কেন, আর এক কাপ চা না আসা পর্যন্ত ওর বাবা কাগজ পড়ে যান চুপচাপ। চা এলে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে সিগারেট ধরান। সিগারেট খাওয়ার পরে মেঝেতে পা দেন যখন, তখন ঘড়ির কাঁটা এক দৌড়ে অনেকখানি চলে যায়। মেঝেতে দাঁড়িয়ে বাবা মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙেন, তারপর টুথ-ব্রাসে পেস্ট লাগিয়ে দুলকি চালে বাথরুম যান। তারপর দাড়িকামানো, চান করা। চান করার পরেই বাবা ঘড়ি দেখে "দেরি হয়ে গেল, দেরি হয়ে গেল" বলে ছুটোছুটি শুরু করে দেন হঠাৎ।

অতনু ঘুম থেকে ওঠে ছটার সময়। সেদিন ঘুম ভাঙার পরেও বিছানা ছেড়ে উঠল না। বাবা পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, বাবাকেও ও প্রতিদিনের মতো ধাক্কাধাক্কি

করে ওঠাবার চেষ্টা করল না।

মা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, "ওমা! তুই এখনও উঠিসনি? শিগ্‌গির ওঠ, ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে।"

অতনু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি আজকে স্কুল যাব না।"

"কেন রে, কী হল। শরীর খারাপ?"

"না।"

"তবে?"

"আমাকে মিস তিনদিন বলেছেন, 'সো লেট', একদিন বলেছেন 'টু লেট', আর কালকে বলেছেন, 'আবার যদি দেরি করো, তোমাকে ক্লাসে ঢুকতে দেব না।' আমি আজকে স্কুলে যাব না।"

মা বেডসাইড টেবিলের ওপর চায়ের কাপটা ঠক্ করে নামিয়ে রেখে বললেন, "শুয়ে থাকলে তো দেরি হবেই, উঠে পড়, ও-ও-ঠ।"

অতনু পাশ ফিরে শুয়ে আরও গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার জন্যে একদিনও দেরি হয়নি, রোজ-রোজ দেরি হয় বাবার জন্যে। আমি আজকে স্কুলেই যাব না।"

মা কী যেন উত্তর দিতে গিয়েও দিলেন না, তারপর অতনুর বাবাকে বেশ জোরে ধাক্কা দিতে দিতে বললেন, "শুনেছ, অতনু বলছে স্কুলে যাবে না। তা ওরই বা দোষ কী, তোমার জন্যে দেরি হয় রোজ, আর ও বেচারা বকুনি খেয়ে মরে। যাক, স্কুলে যাওয়ার আর দরকার নেই। চা রইল।" বলেই ওর মা জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অতনুর কিছু কথা আর ওর মায়ের সব কথা কানে যেতেই অতনুর বাবা সেদিন উঠে পড়লেন চটপট। তারপর চা খেয়ে টুথব্রাসে পেস্ট লাগিয়ে একটানে অতনুকে তুলে দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। দেখবি, আজকে অনেক আগে আমরা স্কুলে পৌঁছে যাব।"

অনেক আগে না হলেও সেদিন ক্লাস শুরু হওয়ার একটু আগে বাবার হাত ধরে স্কুলে পৌঁছে গেল অতনু। এইভাবে চলল কিছুদিন, তারপর আবার যে-কে-সেই। বাবা আগের মতো বিছানায় শুয়ে উ-আ করেন, বুকের নীচে বালিশ দিয়ে চোখ বুজে চা খান, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বলেন, "কই, আর এক কাপ চা দাও।"

ফলে, আবার স্কুলে পৌঁছতে দেরি হতে লাগল অতনুর। ও ক্লাসে ঢোকার সময় মিস কয়েকদিন রাগ-রাগ মুখ করে তাকালেন, তারপর একদিন আগের মতো বললেন, "সো লেট!"

শুকনো মুখ করে বাড়ি ফিরল অতনু। অন্যান্যদিন ও রাত্তির আটটা সাড়ে-আটটায় খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে, সেদিন ও কিছুতেই শুল না। বাবা রোজ রাতে অফিসের কিছু কাজ বাড়িতে বসে করেন, তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেক রাত্তির পর্যন্ত বইপত্তর পড়েন। মাঝেমধ্যে রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে অতনু দেখে, বাবা মাথার নীচে দুটো বালিশ দিয়ে বই পড়ছেন।

কাজের টেবিলের পাশে ওকে ঘুরঘুর করতে দেখে বাবা বললেন, "কী রে, তুই ঘুমোতে গেলি না।"

"না। তোমার হোম-ওয়ার্ক হয়েছে?"

অতনুর ধারণা, ওর বাবাদের অফিসটাও একটা স্কুল। সেই স্কুলে মিস আছেন, হেড-মাস্টারমশাই আছেন। টীচাররা বাবাকে হোম-ওয়ার্ক দেন। সেই হোম-ওয়ার্ক বাবা রোজ রাত্তিরে করেন।

অতনুর কথা শুনে বাবা একটু হেসে

"নিখুঁত পরিষ্কার"

আমি সাবান চাইতেই
[illegible] হুইল–
বলল, "এর দাম সাবানের
চেয়ে বেশী নয়।"
পদ্মা, [illegible]

কাপড়ের ময়লা এমন
চমৎকারভাবে ধুয়ে
বেরোয় দেখে আমি
তো অবাক! চোখে
দেখেও বিশ্বাস
হয় না—হুইল-এ,
কী দারুণ ফেনা হয়!

হুইল, সাবানের চেয়ে
কত বেশী কাপড় ধোয়…
তাও নিখুঁত পরিষ্কার
ক'রে। সাবান তো শুধু
পুরোনপন্থীদের জন্যেই…

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি—চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.10-1810 BG

বললেন, "এই হয়ে গেল বলে। তুই শুতে যা।"

অতনু শুতে না গিয়ে টেবিলের এক কোনায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

বাবা বললেন, "কীরে, কী হল? শুতে যাবি না?"

অতনু ঠিক বড়দের মতো মুখ করে বলল, "তুমি তোমার হোম-ওয়ার্ক তাড়াতাড়ি সেরে নাও। তারপর আমার সঙ্গে শোবে।"

"কেন?"

"তাড়াতাড়ি না শুলে ভোরে উঠতে পারবে না। জানো না আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ..."

বাবা হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "ঠিক বলেছিস, এক্ষুনি যাচ্ছি।"

বাবা আবার কাগজপত্র টেনে নিলেন।

অতনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বাবা, আমাকে হোস্টেলে ভর্তি করে দেবে?"

"কেন?"

"তাহলে আমার আর স্কুলে যেতে দেরি হবে না।"

"কিন্তু তুই হোস্টেলে চলে গেলে আমাদের কত কষ্ট হবে বল!"

অতনু কী যেন ভেবে বলল, "তাহলে এক কাজ করো। মা তো আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসে, মায়ের একদিনও দেরি হয় না। এবার থেকে মা আমাকে স্কুলে দিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে তুমি।"

"তা কী করে হবে! মায়ের সকালে রান্না-বান্না থাকে, আর তোর যখন স্কুল শেষ হবে তখন তো আমি অফিসে থাকব।"

অতনু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "কিন্তু তোমার জন্যেই তো আমার রোজ-রোজ স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায়!"

"আর তোর জন্যে যে আমি রোজ দেড় ঘন্টা আগে অফিসে পৌঁছই। আমার অফিস শুরু হয় দশটায়। তোর স্কুলও যদি দশটায় বসত, তাহলে আমরা দুজনেই ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারতাম!"

অতনু কিছুক্ষণ গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে থেকে ছুট্টে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অতনুর বাবা আরও কিছুক্ষণ অফিসের কাজকর্ম করলেন। তারপর খেয়েদেয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখেন অতনু তখনও জেগে আছে। "কী হল, তুই এখনও ঘুমোসনি?"

অতনু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি এখন বইটই পড়বে না। শিগগির শুয়ে পড়ো, নাহলে ভোরে উঠতে পারবে না।"

বাবা সত্যিসত্যিই একটা বই তুলে নিয়েছিলেন টেবিল থেকে। অতনু কিছুতেই সেটা পড়তে দিল না বাবাকে।

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার জন্যেই বোধহয় পরদিন একটু সকাল-সকাল উঠে পড়লেন অতনুর বাবা।

অতনু যখন স্কুলের ড্রেস পরে শার্পনার দিয়ে পেনসিলের শিস কাটছিল তখন ওর মা ওর বাবাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "অতনু এ চিঠিটা তোমাকে লুকিয়ে পোস্ট করে দিতে বলেছে আমাকে।"

ভাঁজ-করা চিঠির ওপরে লেখা—বাবাদের অফিসের হেডমাস্টারমশাই।

অতনু ভেতরে লিখেছে, শ্রদ্ধেয় হেড-মাস্টারমশাই, বাবার জন্যে রোজ আমার স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায়। আপনি আপনাদের অফিস আটটায় শুরু করবেন। তাহলে বাবাকে তাড়াতাড়ি বার হতে হবে। বাবা তাড়াতাড়ি বার হলে আমিও তাড়াতাড়ি স্কুলে পৌঁছে যাব। আমার চিঠির কথা বাবাকে বলবেন না কিন্তু। বললে বাবা আমাকে বকবে। প্রণাম নেবেন। ইতি অতনু।

বাবা মুচকি হেসে চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। একটু পরে এক হাতে অতনুর হাত অন্য হাতে বইয়ের বাক্স নিয়ে রওনা দিলেন স্কুলের পথে। সেদিন অতনু স্কুলে পৌঁছে গেল ঠিক সময়ে।

বাবা প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন সন্ধে সাতটা নাগাদ। সেদিন ফিরলেন সাড়ে-সাতটায়। বাবার হাতে একটা চৌকো কাগজের বাক্স। দেখেই অতনু "কী-কী" বলে লাফিয়ে উঠল।

বাক্স খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা চমৎকার দেখতে টেবল-ক্লক। অতনুদের বাড়িতে একটা দেওয়াল-ঘড়ি আর দুটো রিস্ট-ওয়াচ আছে, কিন্তু টেবল-ক্লক একটাও নেই। অতনু বলল, "বাবা, এ ঘড়িটা কেন এনেছ?"

বাবা মুখ শুকনো করে বললেন, "আর বলিস কেন, আমাদের অফিসের হেডমাস্টার-

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়
সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান
যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই
কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

মশাই আমাকে ডেকে বললেন, কাল থেকে অফিস শুরু হবে সকাল আটটায়। তা, আমি তো ভোরে উঠতে পারি না, তাই এই ঘড়িটা কিনে এনেছি। ঘড়ি আমাকে ভোরে ডেকে দেবে।"

বাবাদের অফিস সকাল আটটায় শুরু হবে শুনে অতনু চোখ গোল-গোল করে তাকাল মায়ের মুখের দিকে। মা হাসলেন মুখ টিপে।

অতনু বলল, "ঘড়ি কী করে তোমাকে ডেকে দেবে?"

"দেখিস।"

পরদিন ভোর ছটায় ক্রররর ক্রররর করে কী বিকট শব্দ! সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সবার। বাবা উঠে গিয়ে ঘড়ির মাথায় হাত রাখতেই চুপ করে গেল ঘড়িটা। অতনু এই প্রথম অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দ শুনল।

দিন-চারেক অতনু একটু আগেই পৌঁছে গেল স্কুলে, কিন্তু পাঁচদিনের দিন বাবা শোবার সময় ঘড়িটা ওদিকের টেবিল থেকে তুলে এনে মাথার কাছে রেখে দিলেন। পরদিন সকালে অ্যালার্ম বাজতেই বাবা বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে বাজনা থামিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। সেদিন আবার অতনুর স্কুলে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল বাবার জন্যে।

কিন্তু তার পরদিন ভোর ছটায় অ্যালার্ম বাজলে বাবা আর হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা পেলেন না। ঘড়িটা ওই কোণের দিকের আলমারির মাথায়। বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল বাবাকে।

এ-বুদ্ধিটা অতনুর। ওর কথাতেই বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পরে মা অ্যালার্ম ক্লকটা রেখে এসেছিলেন আলমারির মাথায়। এর পর থেকে যে কদিনই বাবা মাথার কাছে ঘড়ি রেখে ঘুমিয়েছেন, সে কদিনই ঘড়ি চলে গেছে আলমারির ওপরে।

অতনুর আর একদিনও স্কুলে পৌঁছতে দেরি হয়নি। ও এখন খুব খুশি। মাঝে মধ্যে ও মাকে ফিসফিস করে বলে, "মা, তুমি বাবাকে বলোনি তো যে আমিই বাবাদের হেড-মাস্টারমশাইকে চিঠি লিখে অফিস আটটা থেকে করিয়ে দিয়েছি।"

বললেই মা ওর গাল টিপে আদর করে বলেন, "পাগল। তাই কখনও বলতে পারি।"

ছবি দেবাশিস দেব

ক্যামেরায় ধরা

শ্রীধর সেনাপতি

বাড়ির সবাই ঠিক করেছে পয়লা জানুয়ারি একটা স্টীমার পার্টি করা হবে। গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ জমবে ভাল। শঙ্খর আনন্দ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এবার ওর জন্মদিনে ছোটমামু ওকে একটা ক্যামেরা উপহার দিয়ে গেছে। ছবি তোলার এই প্রথম সুযোগও তাই এসে গেল শঙ্খর কাছে।

লঞ্চের নাম মরালী। গোড়াতেই সেটার একটা ছবি তুলল শঙ্খ। মরালী আউট্রাম ঘাট থেকে ছাড়ল সকালে। উত্তরমুখী হয়ে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাবে। হি-হি করা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শঙ্খ দেখল বাবা-মা কাকু-কাকিমা দাদা-দিদি আর তাঁদের বন্ধুরা লঞ্চে উঠেই যেন ওর মতো ছেলেমানুষ হয়ে গেল। অকারণে হৈ-হট্টগোল, চেঁচামেচি, নাচ-গান পর্যন্ত জুড়ে দিল কেউ-কেউ। ছোট-বড়র বিচার নেই।

শঙ্খর নতুন ক্যামেরা ওই সব দৃশ্য পটাপট ধরে রাখতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে হৈ-হট্টগোল কমে গেল অনেকখানি। তখন দলে দলে ভাগ হয়ে লুডো, ক্যারাম, তাস নিয়ে বসে যেতে লাগল সবাই। শঙ্খর মেজদা ও'র টেপরেকর্ডার চালিয়ে দিল ফুল ভল্যুমে। রান্নার আয়োজনেও লেগে গিয়েছে একটা দল। শঙ্খর বয়সি ছেলেমেয়েদের কৌতূহল এখন যেন আকাশছোঁয়া। ওটা কী জিনিস রে, কোন জায়গা বল তো? ওই দূরের উঁচু বাড়িটা দেখেছিস? কে কাকে শুধোয়, কেই বা জবাব দেয়? এমনি চেঁচামেচি করাটাই যেন আসল লক্ষ্য ওদের। শঙ্খদের পাশের বাড়ির বিজন-কাকুর মেয়ে মিমি ছোট ছোট হাতে তালি বাজিয়ে বলে উঠল, ওই যে হাওড়া ব্রিজ।

শঙ্খকে কেউ লক্ষ করছে কি না কে জানে। ওর হাতের ক্যামেরা কিন্তু ছবি তুলে চলেছে মাঝে মাঝেই। আস্তে আস্তে হাওড়া ব্রিজের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল মরালী। ওদের বাঁদিকে একটা জাহাজ মেরামতের কারখানা। তারপর একটা মন্দির। ওদের লঞ্চের কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে একটা জেলে-নৌকো ঢেউ লেগে মোচার খোলার মতো কখনও ডুবছে, কখনও ভাসছে। নৌকোর পালের খুঁটির মাথায় উঠে পালের দড়ি বাঁধছে বুঝি একজন মাঝি।

ক্লিক। শঙ্খ ছবি তুলে নিল দৃশ্যটার। আর, তারপরেই শঙ্খর ক্যামেরার ফিল্ম শেষ! শঙ্খর কান্না পেল। ইশ্! সামনে এখনও সারাটা দিন পড়ে রয়েছে। আরও কত ছবি তোলা যেত! বেশি করে ফিল্ম আনবার কথাটা আগে কেন মনে হয়নি ভেবে নিজের ওপরেই শঙ্খর রাগ হল খুউব! প্রমোদ-ভ্রমণ শঙ্খর কাছে তাই আগের মতো আর জমল না।

সন্ধের দিকে বাড়ি ফিরেই শঙ্খ ক্যামেরা নিয়ে পাড়ার রানাদার স্টুডিওতে গিয়ে হাজির। ছবি কিন্তু ওর কালই চাই। রানাদা তা-না-না-না করে শেষ পর্যন্ত রাজি হল। ছবি কাল বিকেলে পাওয়া যাবে।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একটা ছোট খবরের ওপরে নজর পড়ল শঙ্খর বাবার। উনি একজন জাঁদরেল পুলিস অফিসার। শঙ্খকে ডেকে বললেন, "ওরে শঙ্খ, কাল যখন আমরা গঙ্গার ওপরে লঞ্চে করে বেড়াচ্ছিলাম, তখন গঙ্গায় পড়ে একটা নৌকোর মাঝি মারা গেছে। পুলিস সন্দেহ করে তার সঙ্গী নৌকোর অপর মাঝিকে পাকড়াও করেছে। ওদের দু'জনের মধ্যে নাকি ঝগড়া ছিল। পুলিসের ধারণা মাথায় দাঁড়ের বাড়ি মেরে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তাকে।"

শুনে শঙ্খ বলল, "কাল আমি একটা নৌকোর ছবি তুলেছি, বাবা। নৌকোর এক-জন মাঝি তখন পালের খুঁটির ওপরে উঠে দাঁড়িটাড়ি নিয়ে টানাটানি করছিল। হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে কিছুটা দূরে, তখন আমাদের বাঁ দিকে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছিল। তারই সোজাসুজি গঙ্গার ওপরে ছবিটা তুলেছি।"

শঙ্খর বাবা বললেন, "ঘটনাটা যেন ওখানেই ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে রে শঙ্খ। খবরে দেখছি হাওড়া গোলাবাড়ি থানার এলাকায় নতুন মন্দিরের ঘাটের কাছে ঘটেছে ঘটনাটা। সকাল প্রায় আটটার সময়ে। হুম্। আমাদের লঞ্চটা তো ঠিক ওই সময়েই ও জায়গাটা দিয়ে পাস করছিল।"

শঙ্খ ও-খবর নিয়ে বাবার মতো অত মাথা ঘামাতে চায় না। ও মনে মনে ছটফট করছিল, ওর ক্যামেরাতে ছবি কেমন উঠেছে তা দেখবার জন্যে। এইভাবেই ওর সকাল-দুপুরটা কেটে গেল। বিকেলেই রানাদার স্টুডিও থেকে ছবি নিয়ে এল ও। নতুন ক্যামেরা, নতুন হাত। মাত্র দু-তিনটে ছবি একটু দেখবার মতো হয়েছে। শঙ্খ খুবই মনমরা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রানাদা ওকে উৎসাহ দিয়ে বলেছে, চেষ্টা করতে করতেই একদিন ও ভাল ফোটোগ্রাফার হয়ে উঠতে পারবে। গোড়াতে সবারই এরকমটা হয়।

তবে শঙ্খর তোলা শেষ ছবিখানা মন্দ হয়নি। এটা সেই নৌকোর ছবি। একটা ব্যাপার কিন্তু শঙ্খর মাথায় ঢুকছে না। পালের খুঁটির মাথায় চড়ে বসেছিল একজন মাঝি। তাই দেখেই ক্যামেরাতে চোখ লাগিয়ে শাটার টিপেছিল শঙ্খ। কিন্তু ছবিতে যেন উলটো রকম দেখা যাচ্ছে। মাঝিটার দুটো পা হয়ে গেছে ওপর দিকে আর নীচের দিকে হয়ে গেছে মাথাটা। পালের খুঁটিতে যেন হেঁটমুণ্ড হয়ে ঝুলে পড়েছে মাঝিটা গাজনের সন্ন্যাসীর মতো।

ছবিটি দেখে শঙ্খর বাবা আসল ব্যাপার চট করে বুঝে নিলেন। ওই নৌকোর মাস্তুলের মাথা থেকে মাঝিটি যখন আচমকা নীচে পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে তোলা হয়েছিল ফোটোখানা। নীচে নৌকোর গায়ে লেগেই হতভাগ্য মাঝিটির মাথা ভেঙেছে। এটা একটা দুর্ঘটনা। অপর মাঝিটির কোনো দোষ নেই! এটা নিঃসন্দেহ-ভাবে প্রমাণ করবে শঙ্খর ক্যামেরায় ধরা এই ফোটোখানাই। উনি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

সব ছবি তুলতে না পারার দুঃখটা চলে গেল শঙ্খর মন থেকে। একজন নির্দোষ মানুষকে খুনের দায় থেকে মুক্ত করতে ওর তোলা ছবিই যে সাহায্য করল, এতেই গর্বে বুক ভরে উঠল শঙ্খর। ওই বিশেষ ছবিটি দেখিয়ে এরপর থেকে শঙ্খ একটা রোমাঞ্চকর গল্প শোনাতে পারবে।

ছবি দেবাশিস দেব

বাড়িতে নাতি-নাতনিদের খেলার সঙ্গী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। খেলনার দিকে তাঁর বরা-বরের ঝোঁক। কোনো কলের খেলনা বাড়িতে এলেই তিনি সেটি খুলে পরীক্ষা করতেন। তাঁর মা কিংবা স্ত্রীর চোখে পড়লে তাঁরা বলতেন, "গেল এবার খেলনাটা।" তিনি কিন্তু ঠিক জুড়ে দিতেন সেটা। বোধহয় খেলনা-পুতুলের হাত-পা জুড়তে জুড়তেই তিনি কোনোদিন বলেছিলেন, "আমি হয়তো ভাল ডাক্তার হতে পারতুম।" তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি দিল, অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "যাক এতদিনে ডাক্তার হবার সাধ মিটল।"

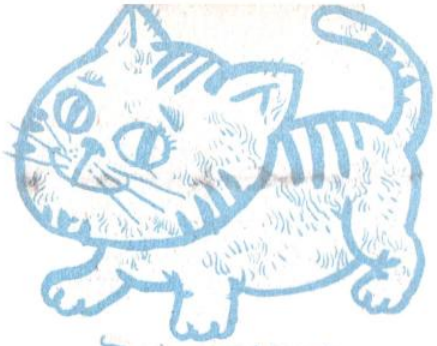

টুকুর ভাবনা

শ্যামলকান্তি দাশ

যখন তখন বেড়াল ডাকে
যখন তখন কুকুর
এই পাড়াটা কেমন যেন
ঘুম আসে না টুকুর।
'ভয় নেই রে, আমরা আছি'
চ্যাঁচাক যতই বাপী
টুকু জানে সন্ধে হলেই
ভূতের দাপাদাপি
চলতে থাকে ছাদের উপর,
পড়তে থাকে ঢিল
দুপুররাতে কেউ খুলে দেয়
শোবার ঘরের খিল।
বাসনকোসন ছড়িয়ে পড়ে
উড়তে থাকে তুলো,
বালিশটা ঠিক ফাটিয়ে গেল
পাশের বাড়ির হুলো।
এই পাড়াটা কেমন যেন
ওই পাড়াটা বেশ,
সকাল বিকেল এই পাড়াতে
কষ্টের একশেষ।
ওই পাড়াটায় হিংসুটে নেই,
ঝগড়াটে নেই, আর,
পা বাড়ালেই খেলাধুলোর
মাঠ কী চমৎকার!
ছুটির দিনে বাস কী মজা,
বন্ধু আসে কত,
এই পাড়াটা কক্ষনো নয়
ওই পাড়াটার মতো।

অঙ্ক-পাখি

রতনতনু ঘাটী

যতই অঙ্ক নিয়ে বসি
মাথাটা যে করে টিন্‌টিন্‌
দুই থেকে এক বাদ দিলে
কেবল যে থেকে যায় তিন!
এই নিয়ে দাদা কত বকে,
'হাঁদারাম, যোগ কি বিয়োগ?'
আমি যত মন দিয়ে কষি
মিলবে না, অঙ্কের রোগ।
দুয়ে দুয়ে যোগ দিলে শুধু
যোগফল হয়ে যায় জিরো
মা বলেন, 'দেখাতুম হাত
থাকতেন যদি সেই কিরো।'
একে একে গুণ করে দিলে
কী করে যে হয়ে যায় দুই
দিদিটাও হেসে হেসে বলে,
'কিচ্ছুটি শিখলি না তুই!'
চারে চারে ভাগ করে ফেলে
ভাগফল পেয়ে যাই চার
চাঁটি মেরে দাদা বলে, 'তোর
পাস করা হবে নাকো আর।'
রোজ রোজ হাত জোড় করে
অঙ্কের দেবতাকে ডাকি—
'আমাকে বানিয়ে দাও খাঁচা,
অঙ্কটা হোক পোষা পাখি।'

ছবি দেবাশিস দেব

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

আদিকাণ্ড

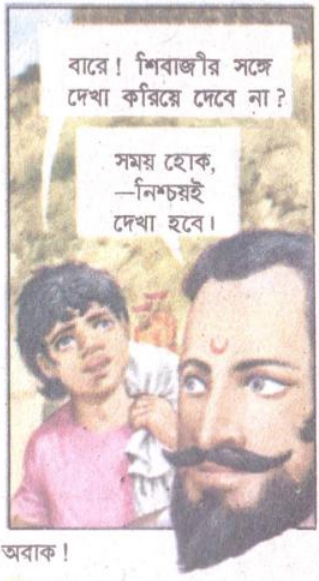

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

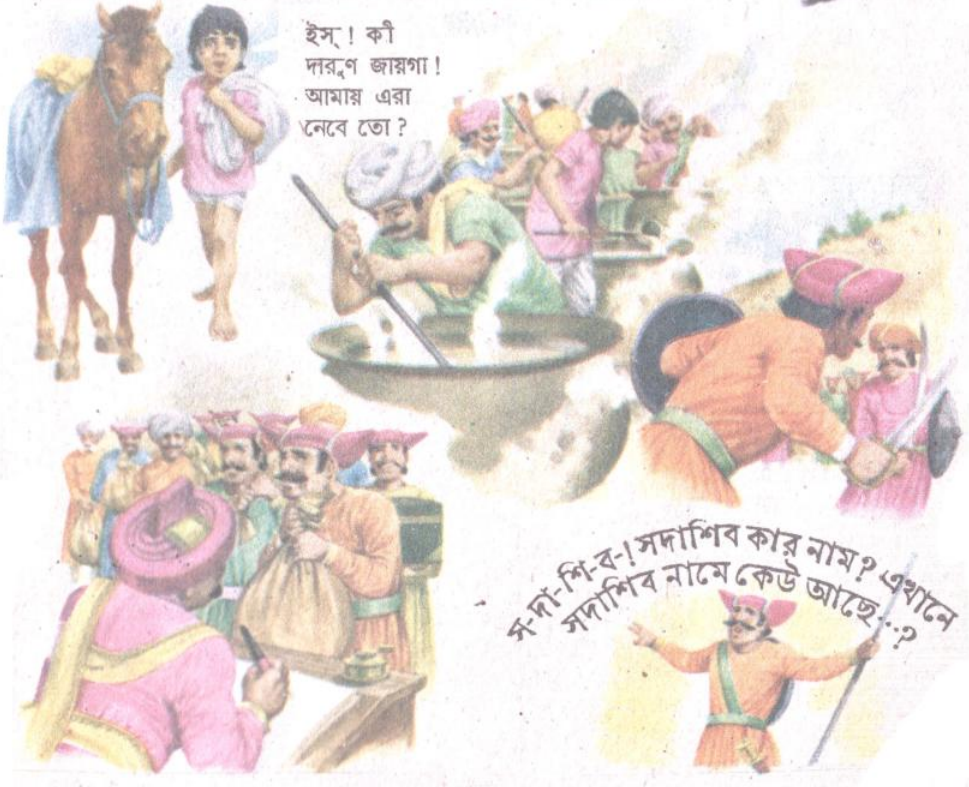

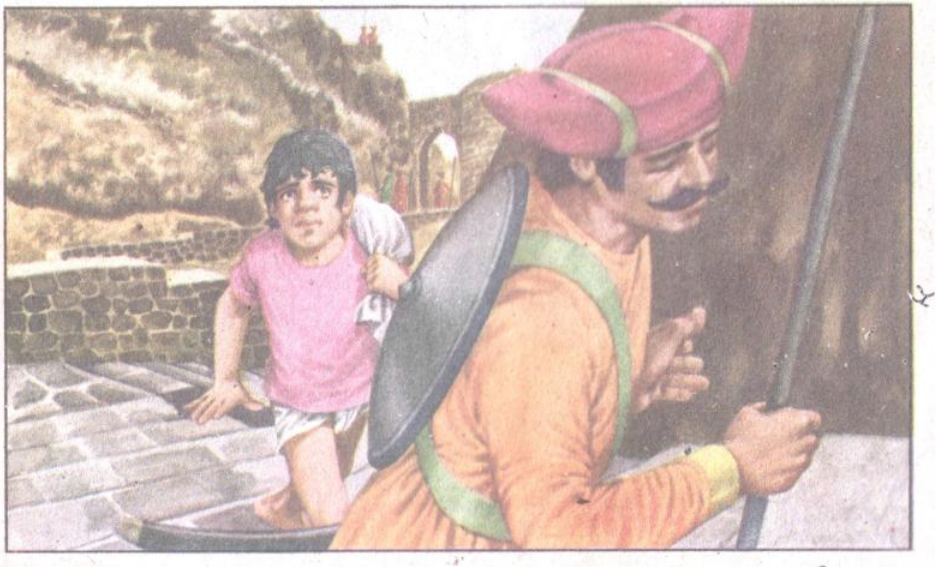

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

ইংল্যান্ড বনাম হল্যান্ডের খেলায় ইংল্যান্ডের নতুন ম্যানেজার রয় একেবারে নতুন করে দল গড়েছে...
তোমাদের কি মনে হয় যে, আমাকে ম্যানেজার করাটা ভুল হয়েছে?
তাহলে এক্ষুনি সে-কথা জানাও!
ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ও ট্রেভর ফ্রান্সিস মুখ খুলেছে...
রয়, তোমার নেতৃত্বে আমরা...
জান দিয়ে লড়ব!
শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রয়!
তাহলে শোনো, হল্যান্ডের বিরুদ্ধে কীভাবে আমরা লড়তে চাই!
আর তো সময় নেই...
এখন জোর দিতে হবে সামর্থ্য, গতি ও শুটিং-শক্তির উপরে। কাল বারের খেলা দ্যাখো...
এত লম্বা-লম্বা পাস দেওয়া অর্থহীন!
খেলোয়াড়রা তালিম নিচ্ছে...
পাসগুলি যেন কার্যকর হয়। ভার্ননের মতো উইঙ্গারকে কাজে লাগাতে হবে...
ভার্নন কাটিয়েছে এবারে ক্রস-পাস
কাছ থেকে দিয়েছে বলেই এতে কাজ বেশি হবে!
বল যাচ্ছে কেভিন টেলরের কাছে...

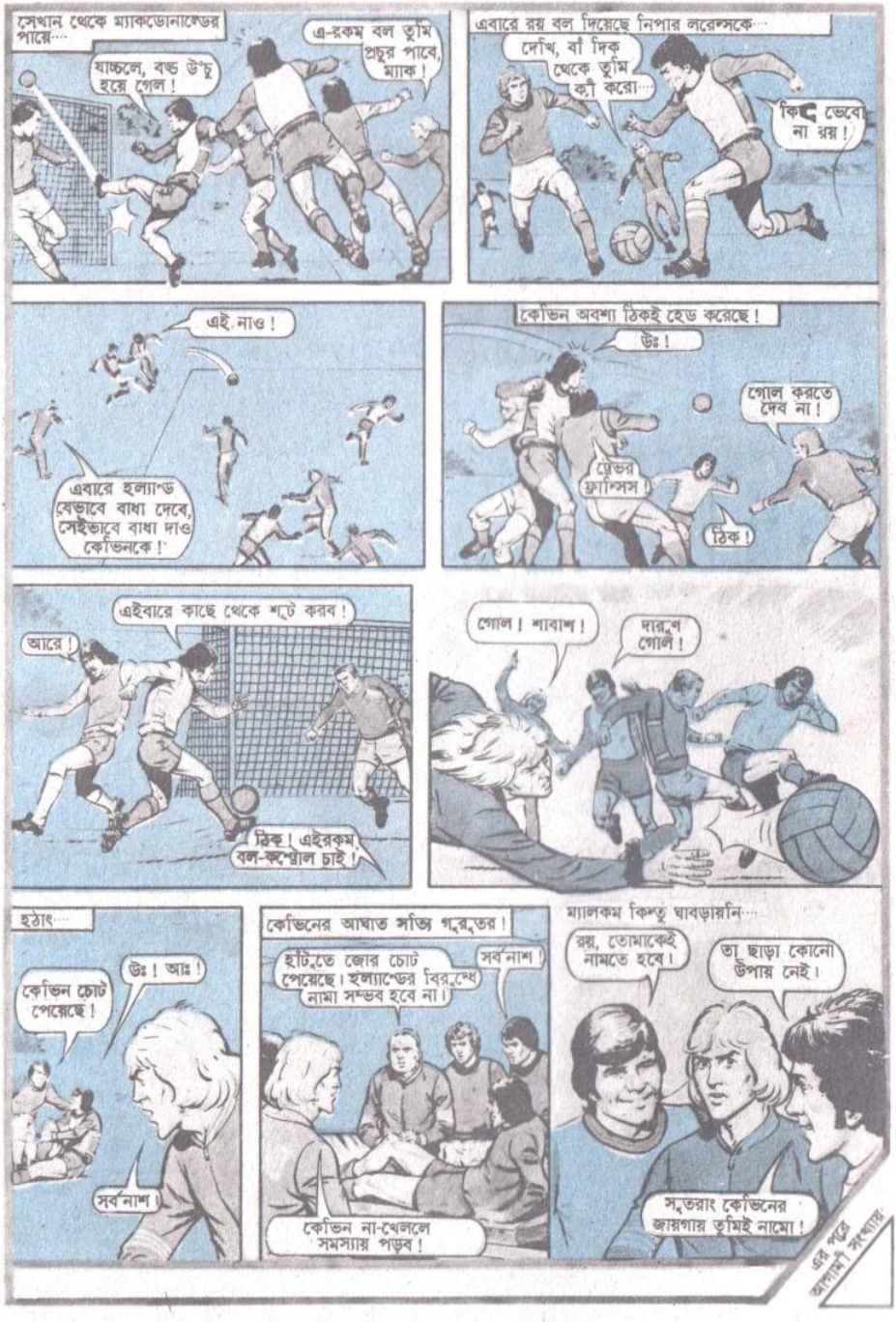
সেখান থেকে ম্যাকডোনাল্ডের পায়ে····
যাচ্ছলে, বড্ড উঁচু হয়ে গেল!
এ-রকম বল তুমি প্রচুর পাবে, ম্যাক!
এবারে রয় বল দিয়েছে নিপার লরেন্সকে····
দেখি, বাঁ দিক থেকে তুমি কী করো····
কিছু ভেবে না রয়!
এই নাও!
এবারে হল্যান্ড যেভাবে বাধা দেবে, সেইভাবে বাধা দাও কেভিনকে!
কেভিন অবশ্য ঠিকই হেড করেছে!
উঃ!
গোল করতে দেব না!
ট্রেভর ফ্রান্সিস!
ঠিক!
এইবারে কাছে থেকে শট করব!
আরে!
ঠিক! এইরকম বল-কন্ট্রোল চাই!
গোল! শাবাশ!
দারুণ গোল!
হঠাৎ····
কেভিন চোট পেয়েছে!
উঃ! আঃ!
সর্বনাশ!
কেভিনের আঘাত সত্যি গুরুতর!
হাঁটুতে জোর চোট পেয়েছে। হল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামা সম্ভব হবে না!
সর্বনাশ!
কেভিন না-খেললে সমস্যায় পড়ব!
ম্যালকম কিন্তু ঘাবড়ায়নি····
রয়, তোমাকেই নামতে হবে।
তা ছাড়া কোনো উপায় নেই।
সুতরাং কেভিনের জায়গায় তুমিই নামো!
এর পরে আগামী সংখ্যায়

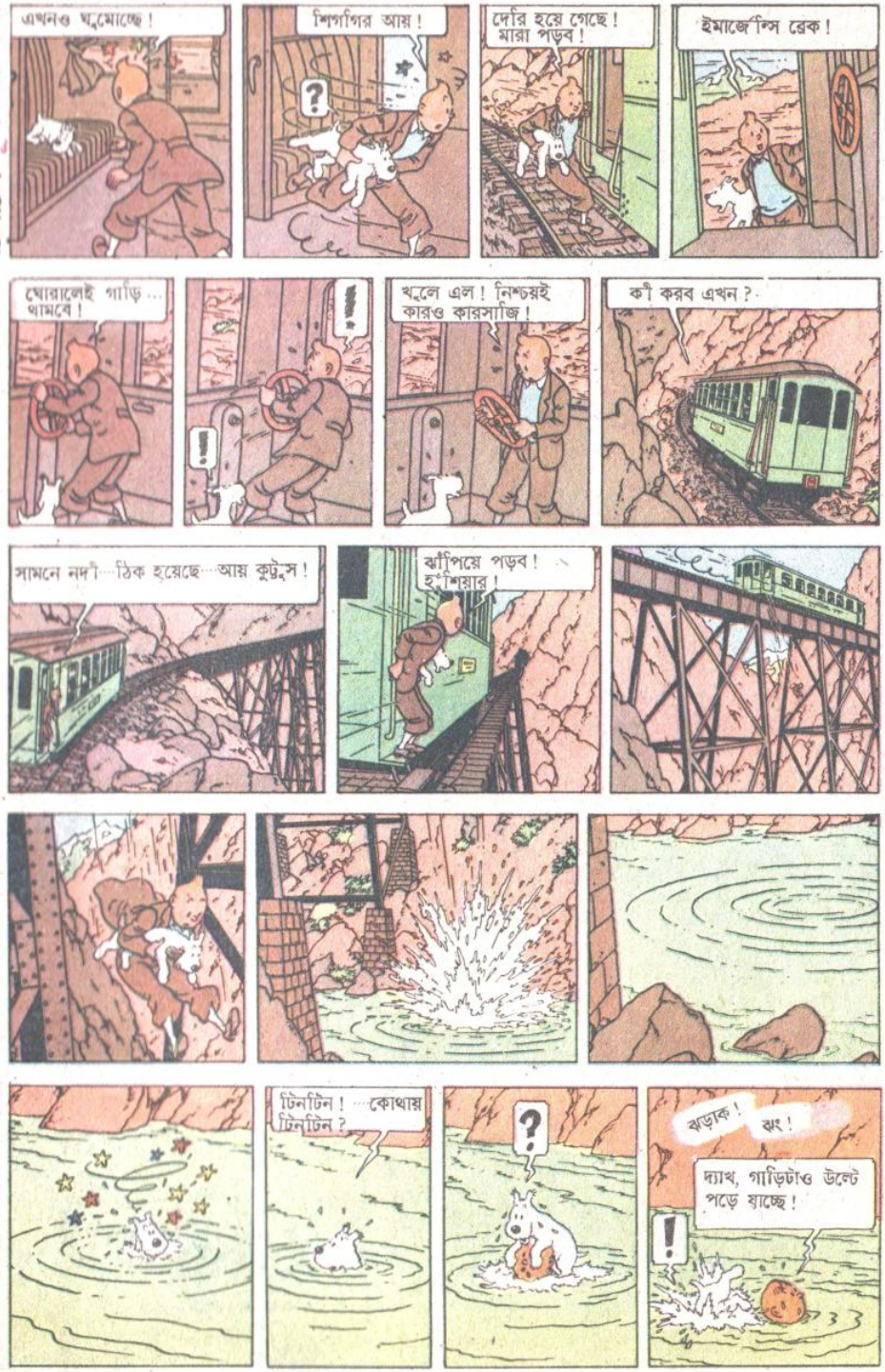
এখনও ঘুমোচ্ছে!
শিগগির আয়!
দেরি হয়ে গেছে! মারা পড়ব!
ইমার্জেন্সি ব্রেক!
ঘোরালেই গাড়ি... থামবে!
খুলে এল! নিশ্চয়ই কারও কারসাজি!
কী করব এখন?
সামনে নদী... ঠিক হয়েছে... আয় কুট্টুস!
ঝাঁপিয়ে পড়ব! হুঁশিয়ার!
টিনটিন! ... কোথায় টিনটিন?
ঝড়াক! ঝং!
দ্যাখ, গাড়িটাও উল্টে পড়ে যাচ্ছে!

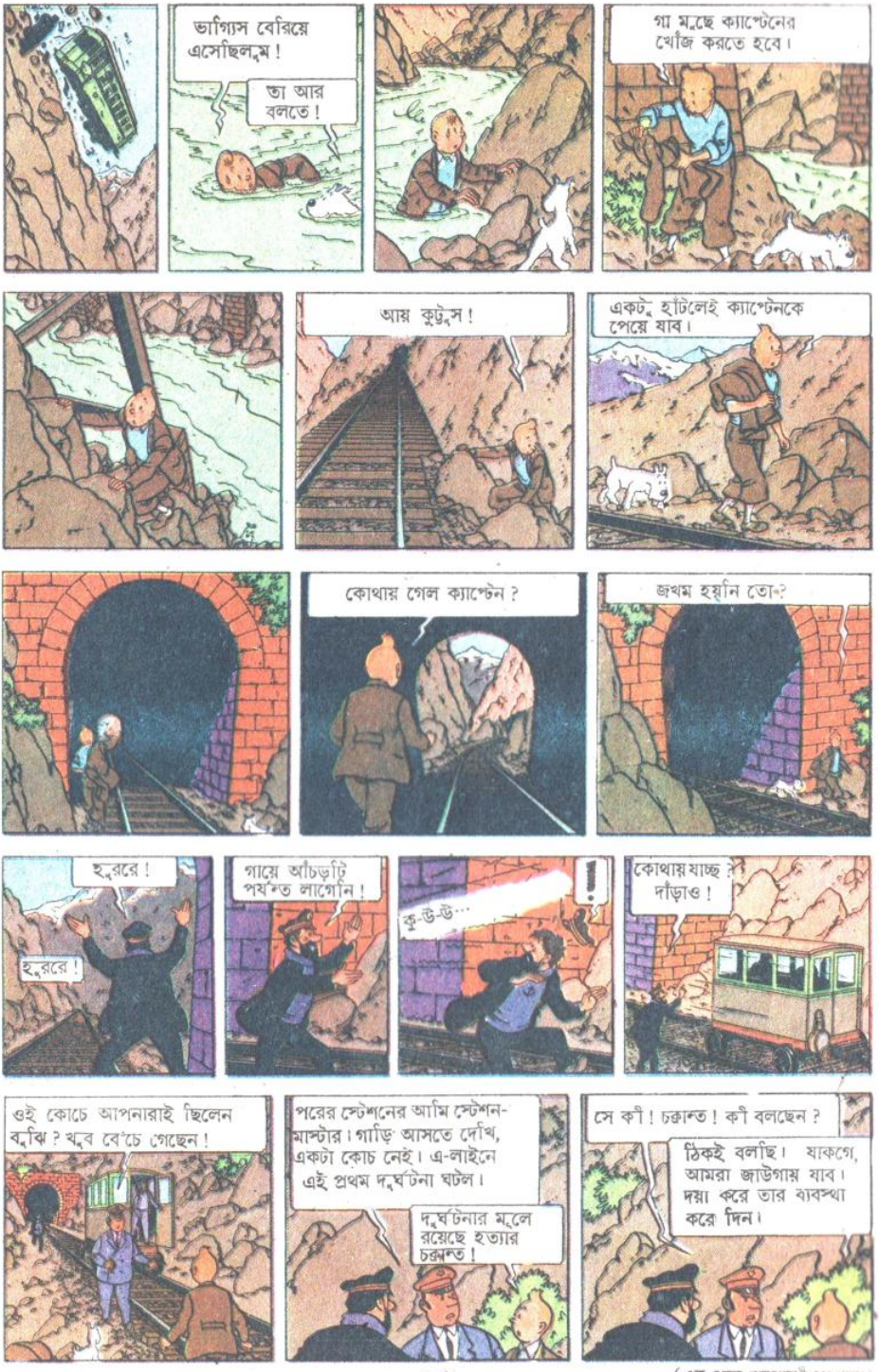

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সাকালে খেঁচে ভীম ভবানী
খেতেন না কো নিম্বু-পানি।
ভ্যানিলা আর স্ট্রবেরির
গন্ধে ভরা ঠাণ্ডা ক্ষীর,
তাতেই তিনি সুখ পেতেন,
দল ফেলে ভাই তাই খেতেন।
সাবড়ে দিতেন কলির ভীম
কোয়ালিটির আইসক্রীম!
মুখে দিলে গলে যায়,
আহারে কি পুষ্টি!
Kwality
আইসক্রীম
KIC 3794

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জাগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু এবারে অভিযানে গেছেন হিমালয়ে এভারেস্ট-চূড়ার দিকে। পথে ইয়েতির মতন কোনো প্রাণীকে দেখে ভয় পেয়ে শেরপা ও মালবাহকেরা পালিয়ে যায়। ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে কাকাবাবু সাহায্য চেয়ে পাঠান নেপাল থেকে। ইতিমধ্যে কাকাবাবু আর সন্তু মাটির তলায় এক গোপন আস্তানায় এসে পড়ে, সেখানে বিদেশী গুপ্তচরেরা অনেক রকম যন্ত্রপাতি বসিয়েছে। কাকাবাবু ও সন্তুকে তারা মেরে ফেলতে চায়। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাবার সুযোগে সন্তু পালিয়ে যায় আরও নীচের সুড়ঙ্গের মধ্যে। কাকাবাবু একটা ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দেন। সেখানে কাকাবাবু উদ্ধারের পথ পেয়ে যান, কিন্তু সন্তু তখনও নীচে কয়েকজন মুখোশ-ধারী তার পেছনে ছুটছে। তারপর—

॥ ২৪ ॥

ছুটতে-ছুটতে সন্তু দেখল, সুড়ঙ্গটা এঁকেবেঁকে যে কতদূর গেছে, তার কোনো ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে আলো, মাঝে-মাঝে অন্ধকার। একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল, কেউ তাকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে কি না। কারুকে দেখতে পেল না।

সুড়ঙ্গের পাশে-পাশে দু' একটা খুপরি-খুপরি ঘর আছে। একটা ঘরে ঢুকে পড়ল সন্তু। ঘরের ভেতরটায় আবছা অন্ধকার। একটুখানি চোখ সইয়ে নিয়ে ঘরটার দিকে ভাল করে তাকাতেই সে আঁতকে উঠল। অজান্তেই তার মুখ দিয়ে "আঁ! আঁ!" শব্দ বেরিয়ে এল।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরপর চারটি ইয়েতি। সাধারণ মানুষের প্রায় দেড়গুণ লম্বা। যেন তারা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিশ্রাম করছে। সন্তু ভয় পেতে না চাইলেও ধক-ধক করতে লাগল তার বুক। সে এক পা এক পা পিছিয়ে যেতে লাগল। এবং পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে।

কিন্তু ইয়েতিরা তাকে তাড়াও করল না, হাত বাড়িয়ে ধরবারও চেষ্টা করল না। তারা দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে।

পড়ে গিয়েও সন্তু হাঁচোড়-পাঁচোড় করে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। তখনই সে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল খুব কাছেই, সুড়ঙ্গের একটি বাঁকে। সন্তুকে যারা ধরবার চেষ্টা করছে, নিশ্চয়ই তারা। পালাবার সময় নেই, এসে পড়বে এক্ষুনি।

তখন, বলতে গেলে এক মুহূর্তের মধ্যে দুটো-তিনটে চিন্তা খেলে গেল সন্তুর মাথায়। তাকে বাঁচতে হবে...বাঁচতে গেলে ঐ ঘরটার মধ্যেই আবার ঢুকতে হবে...দেয়ালে পিঠ দিয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা ইয়েতি নয়। সঙ্গে-সঙ্গে সে দৌড়ে ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়েই একটা ইয়েতির পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

তারপরই সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিনজন লোক। তাদের মুখে হলুদ মুখোশ, এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভলভার। টর্চের আলো ফেলে তারা দেখতে লাগল ঘরের ভেতরটা। একজন ঢুকেও পড়ল ঘরের মধ্যে।

বাইরের একজন ইংরেজিতে বলল, "ছেলেটা গেল কোথায়? এইদিকেই এসেছে।"

ভেতরের লোকটি বলল, "আওয়াজ শুনলাম, মনে হল এই ঘরেই ঢুকেছে।"

আর-একজন বলল, "না, আমার মনে হয় ছেলেটা ওপরে উঠে গেছে।"

ভেতরের লোকটি বলল, "এখানে তো দেখছি না—"

বাইরের একজন বলল, "অন্য ঘরগুলো খুঁজে দেখা যাক।"

আর-একজন বলল, "একবার ওপরে যাওয়া উচিত, ওপরে নানারকম আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু—"

লোকগুলো জুতোর দুপদাপ শব্দ করে এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গের সামনের দিকে।

এই সময়টুকু সন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে ছিল। তার খালি ভয় হচ্ছিল, তার পা দুটো ওরা দেখতে পেয়ে যাবে কি না। লোকগুলো চলে যেতেই তার শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল, সে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

ঘরটার মেঝেতে খড় ছড়ানো আছে। ইয়েতির মতন পোশাকগুলোতেও খড় ভরা। পোশাকগুলো যাতে কুঁচকে না যায়, সেইজন্য খড় ভরে সোজা করে রাখা আছে। সন্তু একটু

সুস্থ হবার পর পোশাকগুলোতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল। প্রথম দেখেই সন্তু এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে সে ভাল করে তাকায়নি। নইলে চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যেত। ওদের চোখের জায়গায় কিছুই নেই। শুধু দুটো গর্ত।

সন্তুর একবার ইচ্ছে হল, সে এই একটা পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়ে ইয়েতি সেজে থাকবে। তা হলে ওরা আর তাকে কিছুতেই খুঁজে পাবে না! কিন্তু পোশাকগুলোর তুলনায় তার চেহারা অনেক ছোট। তাছাড়া... সন্তুর আর-একটা কথা মনে পড়ল, ওপরে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে, কাকাবাবু তো তার মতন আর ছুটে পালাতে পারবেন না। কাকাবাবুকে ওরা এতক্ষণে মেরে ফেলেছে! যাই হোক না কেন, তাকে একবার ওপরে যাবার চেষ্টা করতেই হবে।

ঘরটা থেকে খুব সাবধানে বেরুল সন্তু। দু' পাশে উঁকি দিয়ে দেখল, কেউ নেই। লোকগুলো তাহলে ওপরেই উঠে গেছে বোধহয়। সুড়ঙ্গটা দিয়ে পা টিপে টিপে খানিকটা গিয়েই সন্তু বুঝতে পারল, সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সুড়ঙ্গটার দু'পাশ দিয়েই মাঝে-মাঝে দু'-একটা শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গেছে। এর আগে ছুটে আসবার সময় সে কখন কোনটা দিয়ে এসেছে, তা এখন আর বোঝবার উপায় নেই।

আবার আর-একটা ঘর চোখে পড়ল একপাশে। সে-ঘরটার কোনো দরজা নেই। ভেতরে কী রকম যেন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। একটু উঁকি দিয়ে দেখল সন্তু। ঘরটার মধ্যে একটা খাঁচার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো জ্যান্ত মুর্গি, তাছাড়া পাশাপাশি দুটি রেফ্রিজারেটর, মেঝের এক কোণে স্তূপাকার আলু আর পেঁয়াজ। এটা এদের ভাঁড়ার-ঘর। সন্তুর মনে পড়ল, ওপরে গম্বুজের বাইরে একদিন মুর্গির পালক আর রক্ত দেখতে পেয়েছিল। এরাই ওখানে একদিন একটা মুর্গি নিয়ে গিয়ে মেরে তাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল।

সেখানে বেশিক্ষণ রইল না সন্তু, তাকে ওপরে যেতেই হবে। আবার সুড়ঙ্গপথে এগোতে লাগল সে। যেদিকে আলো দেখছে, সেদিকেই যাচ্ছে, তা ছাড়া পথ চেনার আর কোনো উপায় নেই।

আর-একটা ঘরের কাছাকাছি গিয়ে থমকে যেতে হল সন্তুকে। সে-ঘরের ভেতর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর জোরে-জোরে নিশ্বাস টানার শব্দ।

সে-ঘরটাতেও কোনো দরজা নেই। ঐ ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হবে সন্তুকে। ভেতরের লোকরা যদি তাকে দেখে ফেলে? সন্তু পেছন ফিরে তাকাল, আবার ঐ দিকে যাবে? কিন্তু সামনের দিকটাতেই বেশি আলো, খুব সম্ভবত ঐ দিকেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে শব্দটা শুনতে লাগল সন্তু। কীরকম যেন "কুঁ-কুঁ" আওয়াজ হচ্ছে, তারপরেই দীর্ঘ-শ্বাস ফেলার মতন। মনে হয় কোনো অসুস্থ লোক। এটা কি ওদের হাসপাতাল-ঘর? তাহলে ভয় পাবার কিছু নেই, অসুস্থ লোকেরা তাকে দৌড়ে ধরতে পারবে না।

সাহস করে ঘরটায় উঁকি মারল সন্তু। আবার বুকটা কেঁপে উঠল তার। ওখানে কারা বসে আছে, মানুষ না ভূত? শুধু জাঙ্গিয়া-পরা দু'জন লোক দরজার সোজা-সুজি দেয়ালের কাছে বসে আছে, দেখে মনে হয় যেন মানুষের কঙ্কাল। তারা নিশ্বাস ফেলছে আর "কুঁ কুঁ" শব্দ করছে বলেই বোঝা যায় তাঁরা বেঁচে আছে।

লোক দুটির চোখের দৃষ্টি স্থির, তারা চেয়ে আছে সন্তুর দিকে। একজনকে দেখে মনে হয় চিনেম্যান, অন্যজন কোন্ জাত তা বোঝবার উপায় নেই। তার মুখে লম্বা ঝোলা দাড়ি।

সন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "হু আর ইউ?"

লোক দুটি কোনো উত্তর দিল না, এক ভাবে চেয়েই রইল।

ওদের দেখে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল সন্তুর। ওরা যেন দারুণ অসহায়, বুকের মধ্যে শুধু প্রাণটা ধুকপুক করছে। ওরা নিশ্চয়ই এই গুপ্তচরদের দলের লোক নয়। এই রকমই একজন চিনেম্যানের মৃতদেহ সন্তু দেখেছিল গম্বুজের বাইরে।

এক পা এগিয়ে এসে সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "কে? আপনারা কে? আপনাদের কী হয়েছে?"

লোক দুটির কথা বলার কোনো ক্ষমতা নেই। এই লোক দুটিকেও না খেতে দিয়ে আস্তে-আস্তে মেরে ফেলা হচ্ছে। প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গেলে তারপর ওদের দেহ ওপরে বরফের ওপর ফেলে রেখে আসা হবে। তখন কেউ ওদের খুঁজে পেলেও ভাববে, বরফের রাজ্যে পথ হারিয়ে ফেলে ওরা না খেতে পেয়ে মরেছে।

কিন্তু সন্তু এসব কথা জানে না। সে

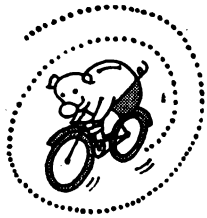

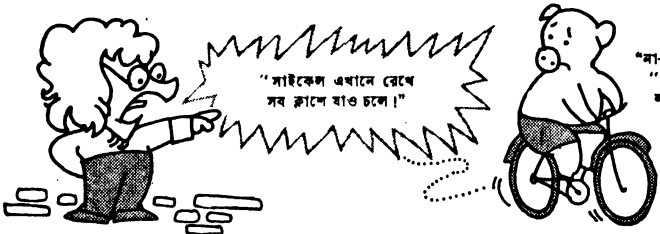

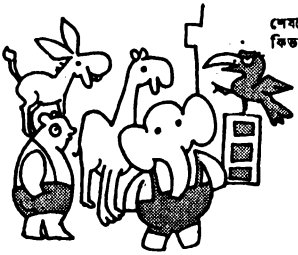

ট্রিং... ট্রিং... ট্রিং...!
শনশন...বনবন...যেন হাওয়ায় উড়ে, সঞ্চয়কুমার চলে নতুন লাল সাইকেল চড়ে! .....
লম্বা ছুটির পর স্কুল আজ খুলছে,
শনশনিয়ে সাইকেলে
সঞ্চয় চলছে।
"আরে বাঃ! কি সুন্দর
সাইকেল!" ভোলা বলে
উদাস স্বরে।
"পয়সা থাকলে
আমিও যেতাম নতুন
সাইকেলে চড়ে!"
বাবামশাই রেগেমেগে
গর্জিয়ে বলে,
"সাইকেল এখানে রেখে
সব ক্লাশে যাও চলে!"
"না–না–না," সঞ্চয় চেঁচিয়ে করে পাড়া মাত
"আমার সাইকেলে কেউ
লাগাবে না হাত।
সাইকেল কিনেছি আমি
নিজ পয়সা দিয়ে
টাকা আমি জমিয়েছি
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে।"
কাল ভুষুণ্ডি কাক বলে
"কক্-কক্-কা,
সঞ্চয় ছাড়া সাইকেলে
আর কেউ চড়বে না?"
সবাইকে ডেকে নিয়ে গেল এক ধারে
ফিসফিস...গুজগুজ...সব মতলব করে।
শেষমেষ সকলে আঁটলো এক ফন্দি
কিভাবে সঞ্চয়কে করবে প্যাঁচে বন্দি।
সঞ্চয়কুমারকে লম্বু করবে তাড়া জোরে
সাইকেল নিয়ে সঞ্চয় তখন যাবে একধারে।
বকবকম তখন শীষ দিয়ে করবে সাবধান
মোটা গণেশ তখনি দাঁড়াবে রাস্তার মাঝখান।
টাট্টু তারপর সাইকেলে মারবে এক লাথ
সঞ্চয় কুমার রাস্তায় পড়ে হবে কুপোকাৎ।
তখন সবাই মিলে সাইকেলটি নিয়ে
শনশন....বনবন যাবে যে পালিয়ে।
হা! হা!
ট্রিং...
ক্রি-রি-ং
ZOOM
কিন্তু কি জানো, মজা হ'ল শেষে, শুনলে সব্বাই তোমরা উঠবে যে হেসে।
সঞ্চয় কুমারকে লম্বু তাড়া যেই করে, সঞ্চয় তখনি সেই লাল সাইকেলে চড়ে,
শনশন....বনবন... পলকে উধাও হ'ল, সকলের দুষ্টু মতলব এমনি ভেস্তে গেল।
গাছের উপর সবুজ টিয়া দেখছিল সব,
চোখ মটকে বলে
"এদের ভেস্তালো মতলব!"
"এস ভাই বাচ্চারা,
নিয়মিত সঞ্চয় করো
জীবনটাকে নানান মজা
খুশি আনন্দে ভরো!"
স্টেট ব্যাঙ্কে নিয়মিত সঞ্চয় করে
দেখো, তোমার টাকা কেমন তরতরিয়ে বাড়ে!
স্টেট ব্যাঙ্ক
আসুন, একসাথে এগোই!

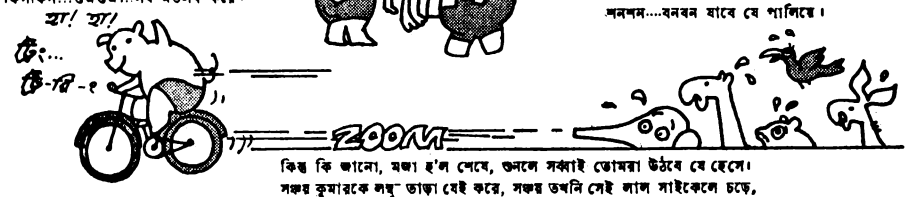

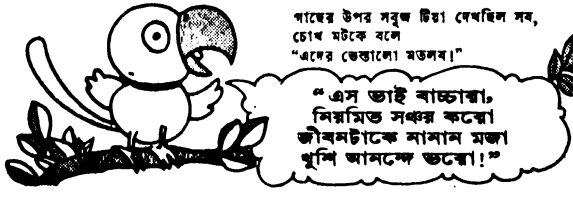

ওদের কোনো রকম সাহায্যও করতে পারছে না। এখানে দেরি করাও অসম্ভব, তাকে ওপরে যেতেই হবে কাকাবাবুর কাছে।

সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লোক দুটো যেন আরও জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল তারপর। বেশ খানিকটা এগিয়েও ওদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল সন্তু। সে দু'হাতে কান চেপে ধরল।

ক্রমেই সুড়ঙ্গের সামনের দিকে আলো বাড়ছে, মানুষের গলার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে। কান থেকে হাত সরিয়ে সন্তু ভাল করে শোনবার চেষ্টা করল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেউ যেন কাকে খুব ধমক দিচ্ছে। ঐ আওয়াজটা আসছে ওপরের দিক থেকে। লোহার সিঁড়িটা তা হলে ঐ দিকেই হবে।

একা-একা অতজন শত্রুর মধ্যে উপস্থিত হয়ে সন্তু কী করবে, তা সে জানে না। কিন্তু কাকাবাবু ওখানে আছেন, তাকে তো যেতেই হবে। এক পা এক পা করে সে এগোতে লাগল। এবার খানিকটা দূরে দেখা গেল নীল রঙের আলো। ঐখানে কাচের বাক্সের মধ্যে গোল যন্ত্রটা আছে, সে ঠিক পথেই এগোচ্ছে। ক্রমশ ওপরের কথাগুলোও শোনা যেতে লাগল স্পষ্ট।

একজন কেউ বলছে, "ওপন দা ডোর... তোমার ভাইপো এখানে আছে। দরজা না খুললে তাকে মেরে ফেলব!"

শুনেই সন্তু বুঝতে পারল, ভাইপো মানে তার কথাই বলা হচ্ছে। কাকাবাবু তা হলে এখনো বেঁচে আছেন। ওরা কাকাবাবুকে মিথ্যে বলছে যে, সন্তু ধরা পড়েছে। তবে কি এখন সন্তুর ওখানে যাওয়া উচিত? সন্তুকে ধরতে পারলে তো ওদের এখন সুবিধেই হবে। কাকাবাবুকে ভয় দেখিয়ে দরজা খোলাতে পারে। এখন তার পক্ষে লুকিয়ে থাকাই ভাল।

আর-একটু এগিয়ে সন্তু আরও কথা শোনবার চেষ্টা করল। কাকাবাবুর গলার আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে না। কেইন শিপটন একাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অনেক কথা বলছে, তার মধ্যে একটা যন্ত্রে হাত দিতে বার-বার নিষেধ করছে কাকাবাবুকে। যন্ত্রটা কোথায় আছে!

সন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, এরই মধ্যে লোহার সিঁড়ি দিয়ে চারজন মুখোশধারী আবার নেমে এল নীচে। সন্তু পেছন ফিরে ছুট লাগাবার আগেই তাদের টর্চের আলো এসে পড়ল তার গায়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু শুয়ে পড়ল মাটিতে। ওদের হাতে রিভলভার আছে, ওরা দেখামাত্র গুলি করবে। সন্তু এটা শিখে রেখেছে যে, মাটিতে শুয়ে পড়লে সহজে গায়ে গুলি লাগে না।

লোকগুলো দৌড়ে আসতে লাগল তার দিকে। তাদের মধ্যে একজন হুকুম দিল, "ডোনট শুট! গেট হিম আলাইভ!"

এই কথা শোনামাত্রই সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় লাগাল। গুলি না করে ওরা তাকে জ্যান্ত ধরবে! আসুক তো কেমন ওরা দৌড়ে ধরতে পারে!

লোকগুলো টর্চের আলো ফেলে রেখেছে সন্তুর ওপর। সন্তু চায় একটা অন্ধকার জায়গা। ডানদিকের আর একটা শাখা-সুড়ঙ্গ দেখে সন্তু বেঁকে গেল সেদিকে। সেদিকটা অন্ধকার। এটা যদি বন্ধ গলি হয়, তা হলে আর সন্তুর নিস্তার নেই। তবু তাকে ঝুঁকি নিতেই হবে।

একটুখানি যেতে-না-যেতেই সন্তুর মুখে টর্চের আলো পড়ল। সামনে দিয়ে দু' তিনজন তেড়ে আসছে। লোকগুলো এরই মধ্যে এদিকে এসে পড়েছে। পেছন ফিরে সন্তু উল্টো দিকে ছুটতে গিয়েই দেখল বাঁকের মাথায় টর্চ জেবলে দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'জন!

ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতন সন্তু একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। সে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না, কিছুতেই না। অথচ আর কোনো উপায় নেই, পালাবার পথ নেই। এই সুড়ঙ্গটার পাশে কোনো ঘরও নেই। দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে দু দল মুখোশধারী। সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "না, আমায় ধরতে পারবে না, কিছুতেই না!"

আর তখনই ওপরে বিরাট জোরে একটা শব্দ হল। এত জোর শব্দ যেন কানে তালা লেগে যায়। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন সব কিছু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। এই সুড়ঙ্গের দেয়াল থেকেও দু' চারটে পাথরের চলটা ছিটকে গেল চারদিকে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বোম্বেটের বাড়ি

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে মান্তু এল বোম্বাইয়ে। এখানে আসার প্রধান কারণ বোধহয় সমবয়সি মাসতুতো ভাই বাল্টির সঙ্গে গল্প করা। মেসোমশাই মাত্র ছমাস আগে বোম্বাইয়ে বদলি হয়েছেন। এর আগে কলকাতায় থাকতেন। মান্তু আর বাল্টি দুজনেই এক স্কুলে পড়ত।

বাল্টিরও ছুটি পড়েছে, তাই জমেছে ভাল। দুই ভাই সবসময় গল্প করছে, বেড়াচ্ছে। একদিন ওরা ঘুরতে ঘুরতে বড় রাস্তার ধারে একটা বিরাট বাড়ির নীচে এসে দাঁড়াল। কুড়িতলা বাড়ি। চারধারে ইঁট, বালি, কাঠের টুকরো ইতস্তত ছড়ানো; কিন্তু কোনো মিস্ত্রি-মজুরের চিহ্ন নেই। অসম্পূর্ণ বাড়িটার কোথাও-কোথাও ভারা বাঁধা থাকলেও বোঝা যায় বহুদিন এখানকার কাজ বন্ধ আছে।

মান্তু প্রশ্ন করে, "সবাই বলে বোম্বাই শহরে বাড়ি পাওয়া যায় না। তাহলে এত বড় বাড়িটা এমনিই পড়ে রয়েছে কেন রে?"

"তা তো জানি না," বাল্টি বলে, "যবে থেকে এসেছি, এই রকমই দেখছি।"

মান্তু বলে, "চল না দেখে আসি কেউ

আছে কি না।"

দুই ভাই সাবধানে অসমাপ্ত বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে ওপরে ওঠে তারা। লিফটের ঘর তৈরি হয়েছে, কিন্তু লিফট বসানো হয়নি, খাঁ-খাঁ করছে গর্ত। দেখলে ভয় করে।

দশতলা পর্যন্ত উঠে ওরা হাঁফিয়ে যায়। বসে পড়ে। বান্টি বলে, "এখনও দরজা-জানলা কিছু বসানো হয়নি। শুধু ফ্রেমগুলো লাগানো হয়েছে।"

মান্তু ভারিক্কি চালে বলে, "তাই নিয়ম। অন্য সব কাজ হয়ে গেলে তারপর কাঠের কাজ হয়।"

বান্টি বলে, "চল, বাকিটা দেখে আসি।"

উনিশ তলায় এসে ওরা বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। এ-তলায় দরজা-জানলা সব লাগানো রয়েছে। শুধু দরজা-জানলাই নয়, তাতে তালাও ঝুলছে।

মান্তু বলে, "এখানে তালা ঝুলছে কেন?"

"মনে হয় বাড়ি তৈরির জিনিসপত্র এর মধ্যে আছে।"

"তাই যদি হবে, তবে একতলায় না-রেখে এত উঁচুতে রাখল কেন?"

"তুই ঠিকই বলেছিস, নিশ্চয় এটা খারাপ লোকেদের আড্ডা। চল একটু ঘুরে দেখি।"

ঘুরতে-ঘুরতে অন্য প্রান্তে এসে তারা দেখল জানলার একটা পাল্লা খোলা রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে নজর চালিয়ে ওরা দেখে, ঐ অবেলায় একটা লোক ঘরের মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাক্স, সুটকেশ, টিন ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে ঘরের চারধারে।

হঠাৎ জল পড়ার আওয়াজে ওরা চমকে ওঠে। দেখে, উপর থেকে নর্দমা দিয়ে জল পড়ছে।

বান্টি ফিসফিস করে বলে, "উপরে নিশ্চয় লোক রয়েছে, চল দেখি।"

উপরে উঠে ওরা দেখে, এখানেও দরজা রয়েছে, তবে তাতে তালা লাগানো নেই। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে, চারজন ষণ্ডাগুণ্ডা লোক তাস খেলছে। দুজনেই ভীষণ ভয় পেয়ে পা টিপে-টিপে নীচে নেমে আসে।

একতলায় নেমে সবে ওরা রাস্তায় পা দিতে যাবে, এমন সময় দেখে উপরে-দেখা লোকের মতো দুটো লোক ঐ বাড়ির দিকে আসছে। ওরা তাড়াতাড়ি হাঁটা শুরু করতেই লোক দুজন দ্রুত তাদের দিকে আসতে-আসতে ডাক দিল, "এই ছেলেরা, দাঁড়াও।"

ওরা একবার ভাবল, দৌড়ে পালাবে। তারপর ভাবল, শোনাই যাক কী বলে, দাঁড়িয়ে গেল।

লোক দুটি তখন তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে যার চেহারাটা বেশি ষণ্ডামতো, সে বলল, "তোরা ও বাড়িতে কী করছিলি?"

মান্তু তাড়াতাড়ি বলল, "আমরা একটা বেড়াল-ছানা ধরেছিলাম, সেটা আমার হাত থেকে লাফিয়ে পড়ে ঐ বাড়ির দিকে গেল, তাই দেখতে গিয়েছিলাম।"

"উপরে গিয়েছিলি?"

"না তো।" বান্টি তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়।

"ঠিক আছে। যা, আর কখনও এদিকে আসবি না। এখানে ভূত থাকে। আজ দশ বছর এই বাড়িটা এমনি পড়ে রয়েছে। যারাই এই বাড়ি করাবার জন্যে এসেছে, ভূত তাদের হয় মেরে ফেলেছে, নয় এমন ভয় দেখিয়েছে যে, তারা আর বাড়ি তৈরির সাহস পায়নি। যা, খুব বেঁচে গেছিস। এ বাড়ির কথা কাউকে বলবি না।"

দুই ভাই তখন ভাবে তাদের কী করা উচিত। হঠাৎ বান্টির মনে পড়ে তার বন্ধু রণবীর সাহানের বাবা পুলিসে বড় কাজ করেন। কথাটা মনে পড়াতেই তারা আর দেরি না করে চলে যায় রণবীরের বাড়ি।

বান্টি সব ঘটনা বলে বন্ধুকে। সে তখন তার বাবাকে ফোন করে। মিঃ সাহানে সব শুনে বান্টি এবং মান্তুকে ঐ বাড়ির দিকে আর যেতে বারণ করে দিয়ে বলেন, "যা করার আমিই করব।"

পরের দিন রণবীর ফোন করে জানায় যে, ঐ বাড়িতে পুলিস গিয়ে একদল চোরা-চালানদারকে ধরেছে। গত দশ বছর ধরে এরা এই বাড়িটি ভূতের বাড়ি এই গুজব রটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের চোরা-কারবার চালাচ্ছিল।

দেশের একটা ভাল কাজ করতে পারায় দুই ভাই খুশি হয়। বলে, যাক, গোটাকয়েক খারাপ লোককে শায়েস্তা করা গেল।

ছবি অনুপ রায়

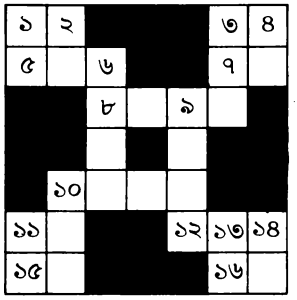

সংকেত ঃ পাশাপাশি ঃ (১) ধাতুবিশেষ। (৩) যে-পাখি উলটো দিক থেকে ফুল। (৫) যে-খেলনার সঙ্গে পৃথিবীর তুলনা করা হয়। (৭) শঙ্খ। (৮) হলুদ রঙের পাখি। (১০) সূর্য। (১১) পর্বত। (১২) দেশভ্রমণ। (১৫) মানুষের তো আছেই, চিরুনিরও আছে। (১৬) হালকা।

উপর-নীচ ঃ ১। দরজার কোন জিনিস কানে লাগে? ২। প্রতিমা তৈরির উপকরণ। ৩। গাছের ছাল। ৪। ফলের নামে পুরাণোক্ত দ্বীপ। ৬। মুসলমান দানসাগর। ৯। পদ্ম-ফুল। ১০। আকাশ যেখানে মাটির সঙ্গে মিশেছে মনে হয়। ১১। নদীর আর-এক নাম। ১৩। পরীক্ষার পর তোমরা কিসের আশায় থাকো? ১৪। সূর্যবংশের বিখ্যাত রাজা।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ডা	কা	ত		পা	ল	কি
লি	লি				তা	রা
য়া		ম		বে		ত
		হ	ব	হ		
প্র		য়া		লা		কৌ
লা	মা				দে	শ
প	ঞ্জা	ব		অ	হ	ল্যা

সেজদাদু গল্প বলছিল, আমরা সবাই হাঁ করে শুনছিলাম। আমরা মানে, আমি, ছোট্‌কা, ছোড়দি, গৌরী, বাবা, মা।

এক যুদ্ধের গল্প। যুদ্ধের বর্ণনা দারুণ ইনটারেস্টিং করে বলে যাচ্ছিল সেজদাদু।

গল্প শেষ হল একসময়। আমরা সেজদাদুকে ধরেছি, আর একটা গল্প বলো—এমন সময় ছোট্‌কা বলল, "আমিও একটা যুদ্ধের গল্প বলব। কিন্তু সেটা বিশেষ করে গৌরী আর সতুবাবুর জন্য। তবে ওদের যদি আপত্তি না থাকে তোমরাও শুনতে পারো।"

"বা রে, আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?" গৌরী প্রশ্ন করল ছোট্‌কাকে।

"থাকতেও তো পারে।" ছোট্‌কা মজার মুখ করে বলল, "গল্পটার শেষে রয়েছে একটা ধাঁধা। সেটার

উত্তর করতে বলব তোমাদের দুজনকে। যদি না পারো, সকলের সামনে অপ্রস্তুত বোধ করবে তো! তাই বলছিলাম—"

ধাঁধার কথা শুনে সকলেই একটু নড়েচড়ে বসল। কেউ উঠবার নাম করল না। ছোট্‌কা বলে গেল। গল্পটা সবটা আর বলছি না, শুধু ধাঁধাটুকু বলছি। তোমরাও চেষ্টা করো।

প্রথম ধাঁধা ॥ দুই সৈনিক দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে এক বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সঙ্গে খাবার ছিল, ছিল পানীয়। খাবার সমান ভাগ করে নিল দুজনে। কিন্তু মুশকিলে পড়ল পানীয় নিয়ে।

২৪ আউন্স পানীয় রয়েছে একটা বোতলে। আর রয়েছে দুটো খালি পাত্র। একটায় ধরে ১১ আউন্স, অন্যটায় ধরে ৫ আউন্স পানীয়।

দুজনে মাথাপিছু বারো আউন্স করে ভাগ করে নিতে চায়। কিন্তু কীভাবে ঢালাঢালি করে ঠিক সমান দু-ভাগ করবে বুঝতে পারছে না।

অবশেষে একজন সৈনিক হিসেব করে দেখল, এ-পাত্র থেকে ও-পাত্রে মোট সাতবার ঢালাঢালি করে নিয়ে ২৪ আউন্স পানীয় সমান দু-ভাগ করে নেওয়া সম্ভব-পর। তাই করা হল। কীভাবে বলো তো?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একজনকে বয়স জিজ্ঞাসা করায় সে রহস্য করে উত্তর দিল. আমার এখনকার বয়সকে উল্টে দিয়ে যদি তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে আমার চৌত্রিশ বছর আগের বয়স পাওয়া যাবে।

লোকটির এখনকার বয়স কত?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ সকালবেলা একজন লোক সূর্যের দিকে মুখ করে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে বাঁ দিকে ঘুরল। কিছুটা গিয়ে ফের ডান দিকে ঘুরল। লোকটি এখন যদি সোজা হাঁটে কোন্ দিকে হাঁটবে সে?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও

১১০ (২২১) ৩৩১

৭৪৭ (?) ৯৬৮

গতবারের উত্তর ॥ (১) উত্তর হতে পারত ২০+২+১, ১০+৪+১, ১০+২+২, ৮+৫+১ এবং ৫+৪+২। সেক্ষেত্রে বাড়ির নম্বর হত যথাক্রমে ২৩, ১৫, ১৪, ১৪ এবং ১১। এর মধ্যে একমাত্র সংশয় জাগায় বাড়ির নম্বর ১৪ হলে। কেননা, সেক্ষেত্রে দুরকম উত্তর হয়। নিশ্চিত ভদ্রলোকের বাড়ির নম্বর ১৪, নইলে ছোট্‌কার অতিরিক্ত তথ্য দরকার হত না। দুটি ছেলেমেয়ে যেহেতু স্কুলে পড়ে সে-কারণে উত্তর হবে ৮, ৫, ১। ১০+২+২ হলে দুজনের পক্ষে স্কুলে পড়া সম্ভব-পর ছিল না। (২) ১১টি। (৩) ১২, ১০। (৪) দশ বছর বয়স।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

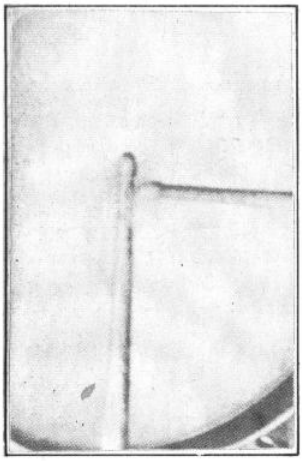

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল বোতামের ফোটো
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক ছাগল পুষেছেন, আর ছাগলগুলো রোজ আমাদের বাগানে ঢুকে ফুলগাছ খেয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোককে বলেও ছাগল আসা বন্ধ করা যাচ্ছে না। কী করা যায় বলুন তো?

উঃ ভদ্রলোককে রাত্রে লুচি-মাংস খাওয়ার নেমন্তন্ন করে এসো।

প্রঃ রেস্টুরেন্টে গরম স্যুপ দিয়েছে, তার মধ্যে মরা মাছি। এ-রকম অবস্থায় ওয়েটারকে ডেকে কী বলা যায় বলুন তো?

উঃ ওয়েটারের কিছু করার নেই, গরম স্যুপে পড়লে মাছি মরবেই।

সুসেন

মজার খেলা

এই খেলায় অল্প প্রস্তুতি দরকার। বেশ কয়েকটা বড় পিজবোর্ডের বাক্স যোগাড় করো। একেকটা বাক্স নাও তারপর পুরো বাক্সটার খবরের কাগজ সেঁটে দাও, বাক্সের ডালা খোলার সম্ভাবনা যাতে না থাকে। এরপর বাক্সটাকে একটা লেটার-বক্সের মতো কেটে নাও। আসলে বেশ কয়েকটা লেটার-বক্সই তুমি তৈরি করছ, শুধু কাঠের বদলে পিজবোর্ডের। ইচ্ছে করলে বাক্সগুলোকে রঙচঙেও করে নিতে পারো।

বাক্সের ওপরে যেখানে নাম-ঠিকানা লেখা থাকে, সেখানে নানা-রকম লেবেল আটকে দাও। কোনো বাক্সে লেখো 'চিড়িয়াখানা,' কোনোটায় 'স্কুল', কোনোটাতে 'জাদুঘর', কোনোটায় 'সার্কাস'—এইরকম পাঁচ-ছটা বাক্সে লেবেল লাগাও। বাক্সগুলোকে খেলা শুরুর আগে ছাদে বা বাগানে বা ঘরে ছড়িয়ে রাখো। যতগুলো বাক্স, এবার ততগুলো ছেলেমেয়ে যোগাড় করো। প্রত্যেকের হাতে একটা বড় খাম দাও, তার মধ্যে থাকবে অনেক পুরনো চিঠি। বড় খামগুলোর ওপরে বাক্সের মতোই লেখা থাকবে, স্কুল, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সার্কাস—এইরকম সব ঠিকানা।

একেকজনের হাতে একেকটা খাম দিয়ে বলো ছড়িয়ে-থাকা বাক্সগুলোকে খুঁজে ঠিকমতো যাতে

চিঠি ফেলে দিয়ে আসে। কাকে কোন্ ঠিকানা দিলে, অন্য কাগজে লিখে রেখো।

শেষে লেটার-বক্সগুলো খুলে দেখো ঠিক ঠিকানায় ঠিক চিঠি কে ফেলেছে। যে আগে ফেলবে সে-ই জিতবে।

মজারু

হাসিখুশি

এক ভদ্রমহিলা উনুনে ডাল চাপিয়ে অন্য কাজে গিয়েছিলেন। রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন কড়ার চারপাশে ডাল ছিটকে পড়েছে। বুঝতে বাকি রইল না যে, রাস্তা থেকে ক্রিকেট-বল জানলা গলে ডালের কড়ায় ফুটছে। একটু পরেই পাড়ার দুটি ছেলে দরজায় এসে মাসিমা বলে ডাকল। ভদ্রমহিলা বলটা ফেরত দিয়ে বললেন, "তোমাদের খেলার জন্যে আজ আমার এক কড়া ডাল নষ্ট হল।" একটি ছেলে হেসে বলল, "নষ্ট হবে কেন মাসিমা, আমরা তো নোংরা জায়গায় বল পড়লে ধুয়ে নিই—আপনিও ধুয়ে নিন-না ডালটা।"

এক বোকা ছাত্রকে তার গৃহ-শিক্ষক নানান ধরনের প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শেখাবার চেষ্টা করেন। একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ধরো আমাদের বাড়িতে মোট চারজন লোক—একজন আমার মা, একজন আমার বাবা, একজন আমার বোন, আর একজন কে বলো তো?" ছাত্রটি অনেক ভেবেও ঠিক উত্তর বলতে পারল না। তখন গৃহশিক্ষক তার পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বললেন, "দূর বোকা, আর-একজন তো আমি নিজে—এই সোজা ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না?"

বোকা ছেলেটি ভাবল, ভারী মজা তো! সে আবার পরে এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল ওই প্রশ্নটা। বন্ধু বলল, "এ আবার কঠিন কী—আর-একজন হচ্ছিস তুই।"

ছেলেটি বলল, "ঠিক জানতাম পারবি না। আর-একজন হচ্ছেন আমার মাস্টারমশাই।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির বিশেষ কোমল পদ্ধতিতে

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীতে একটি বিশেষ উপাদান আছে যা ত্বকের ভেতরে গিয়ে স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে,আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে···

অথচ আপনার ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে। ৬ সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে !

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী– ফর্সা হবার কোমল উপায়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-FALOV.10-172 BG

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতিকে চুরি করেছেন চন্দ্রভানু। কিন্তু ট্রেন-যাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিসের হাতে আটক বেহুঁশ একটি ছেলেকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেন জয়রাম। স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে ঠাঁই পায়। পরে সেখানকার ধনী বাসিন্দা সূর্যনারায়ণের কাছে। তার নাম এখন দেবদত্ত, ওরফে দেবু। সূর্যনারায়ণ জয়রামের বন্ধু; কিন্তু দেবু যে জয়রামের ছেলে, সূর্য তা জানেন না। ওদিকে নকল-জ্যোতিকেও চন্দ্রভানু চুরি করেছেন। গাড়ি চালাতে গিয়ে সে দুর্ঘটনা ঘটায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হবে। শোকার্ত জয়রাম সূর্যনারায়ণের বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু দেবু ইতিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘর ছেড়েছে। দেবু ও সন্ন্যাসী এখন ফুলডাঙায়। সন্ন্যাসীর কৃপায় বিস্তর লোকের অসুখ সেখানে সেরেছে। তারপর—

॥ ২১ ॥

পা কেটে ফেলতে হবে!

ভাবতেই শিউরে উঠলেন চন্দ্রভানুবাবু। এত টাকা খরচ করে, এত কষ্ট স্বীকার করে যে-জ্যোতিকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন, সেই জ্যোতির শেষকালে এই পরিণতি হবে? চন্দ্রভানুবাবুর দু চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। তাঁর অনেক টাকা, অনেক প্রতিষ্ঠা, অনেক প্রতিপত্তি। লোকে তাঁর টাকার জন্যে তাঁকে দেবতা বলে মনে করে। তিনি এ-অঞ্চলের একচ্ছত্র সম্রাট। তিনি সরকারি বে-সরকারি সমস্ত রকমের কাজ করে সকলের কাছ থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছেন। অনেক বাড়ি তৈরি করেছেন, অনেক সরকারি অফিস তৈরি করেছেন। নিজেরও একটা বিরাট বাড়ি হয়েছে। কিন্তু বাড়ি হলে কী হবে, বাড়ির মধ্যে কিছু নেই। শান্তি নেই, আনন্দও নেই। সেই আনন্দটুকু পাবার জন্যেই জ্যোতিকে এখানে নিয়ে এসে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন নিজের জীবনে তিনি যা পাননি তিনি জ্যোতির মধ্যে দিয়ে তা পূরণ করে নেবেন।

কিন্তু এবার?

জ্যোতিকে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার থেকে তার কেবিনের বিছানায় এনে শুইয়ে দেওয়া হল। অজ্ঞান অচৈতন্য জ্যোতির দিকে চেয়ে তিনি অনেকক্ষণ বসে রইলেন। আর নিজের অতীত আর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলেন।

তাঁর ম্যানেজার এসে বললেন, "স্যার, আর কতক্ষণ বসে থাকবেন? খাবেন না আজ?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন "না।"

"না খেলে যে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে, স্যার।"

"তা হোক, শরীর ভাল নিয়ে কী করব আমি?"

"আমি ততক্ষণ এখানে বসে আছি, আপনি খেয়ে নিয়ে আবার আসুন।"

কিন্তু না, চন্দ্রভানুবাবু উঠলেন না। ঠায় বসে রইলেন তিনি সেখানে। প্রায় দু ঘণ্টা পরে জ্যোতির জ্ঞান ফিরল। তিনি মুখ নিচু করে জিজ্ঞেস করলেন "এখন কেমন আছ তুমি জ্যোতি?"

জ্যোতি বোধহয় কথাটা শুনতে পেল। তাই একবার ঘোলাটে চোখ দিয়ে দেখলে চন্দ্রভানুবাবুর দিকে। কিছু বলবারও হয়তো চেষ্টা করলে। কিন্তু কোনও কথা বলতে পারলে না।

ফুলডাঙা গ্রামটা এতদিনে বেশ জমে উঠেছে। পাঁড়েজির নিজের বাড়িতে অনেক জায়গা। সেখানেও অনেক লোক থাকতে পারে। বাড়িটা দেখলে বোঝা যায় অনেক পুরনো কালের বাড়ি। এককালে সেখানে অনেক লোক বাস করত। কিন্তু এখন কেউই নেই। একে-একে অনেক শোক-তাপ পেয়ে তিনি পাথর হয়ে গেছেন। কেবল আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মামলায় সর্বস্ব খুইয়েছেন। এখন এই বুড়ো বয়েসে এসে দেখছেন সমস্তই মায়া। এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এই সংসারটাই যত নষ্টের গোড়া।

সাধুবাবা আর দেবু এ-বাড়ির ভেতরে আসে না বেশি। তাদের জন্যে বাড়ির বাইরে আর-একটা জায়গা আছে। তারই কাছাকাছি মন্দির। সেখানে সাধুবাবা ভোর থেকেই

কীর্তন করে। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেবুও গান গায়।

সেই ভোর চারটে থেকেই কীর্তন শুরু হয়ে যায়।

ফুলডাঙার চারদিকের গ্রাম থেকে লোকেরা আসে। যার বাড়িতে যা খাবার আছে সব নিয়ে যায় সাধুবাবাকে দেবার জন্যে। কলা, শশা, বেল থেকে আরম্ভ করে আম কাঁঠাল। আর তা ছাড়া আছে দুধ, দই, ছানা সব কিছু। সাধুবাবা গান গাইতে গাইতে পুজো করে, আর পুজোর পর সব জিনিস সকলকে দিয়ে দেয়।

দেবু বলে, "সাধুবাবা, তোমার নিজের খাবার জন্যে কিছু রাখলে না?"

সাধুবাবা বলে, "ওদের জিনিস তো, আমার নেবার অধিকার নেই।"

"কিন্তু ওরা তো সবাই ওগুলো তোমাকেই দিলে।"

সাধুবাবা বলে, "আমাকে দিলে না, ঠাকুরকে দিলে। ঠাকুরের জিনিস ঠাকুরকেই দিয়ে দিলাম।"

"তা ওরা কি ঠাকুর?"

সাধুবাবা হাসে। "মানুষই তো ঠাকুর রে। মানুষের সেবায়েত আমি। আমি মানুষকেই ঠাকুর মনে করে তাদের সেবা করি। মানুষকে সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হয়।"

"কিন্তু তুমি কী খেয়ে বাঁচবে? তোমারও তো বেঁচে থাকা দরকার। তুমি নিজে না খেলে বাঁচবে কী করে?"

সাধুবাবা বলে, "রামজি যদি আমাকে বাঁচাতে চায় তো বাঁচাবে, আর রামজি যদি আমাকে মারতে চায় তো মারবে।"

দেবু সাধুবাবার কথা শুনে অবাক হয়ে যেত। পাঁড়েজির বাড়ি থেকে খাবার আসত রোজ। খাওয়ার সময় যদি কেউ ভিক্ষে চাইত তো সাধুবাবা তার নিজের খাবার সব দিয়ে দিত। ভিখিরিটা সেই খাবার নিয়ে কৃতার্থ হয়ে তা খেতে খেতে চলে যেত।

কিন্তু ঘটনাটা ক্রমেই গ্রামে-গ্রামে জানাজানি হয়ে গেল। সাধুবাবার পুজোর সময় যেমন সবাই ফল-মিষ্টি নিয়ে আসত তেমনি অনেক ভিখিরিও আসত। সাধুবাবা সেগুলো সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে দিত। তারপর যখন দুপুরবেলা খেতে বসত, তখনও অনেক লোক খেতে আসত। সাধুবাবার নিজের আর খাওয়া হত না। নিজের খাবারগুলো সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিত! সাধুবাবা সারাদিনই উপোস করে থাকত।

দেবু জিজ্ঞেস করত, "তুমি যে কিছুই খেলে না সাধুবাবা!"

সাধুবাবা বলত, "ওরা খেলেই আমার খাওয়া হয়ে যায়। রামজিই ওদের পাঠিয়েছে আমার কাছে, রামজিই ওদের মুখ দিয়ে আমার খাবারগুলো খাচ্ছে—"

আর শুধু কি তাই? কত রোগী আসত সাধুবাবার কাছে। কত লোক অন্ধ হয়ে গেছে, চোখে দেখতে পায় না ভাল করে। সাধুবাবা কোথা থেকে কী গাছের পাতা খুঁজে নিয়ে এসে তা রস করে চোখে মাখিয়ে দিত, আর তারা আবার চোখে দেখতে পেত।

আরো অনেক রকম রোগ সারাতে আসত লোকেরা। সাধুবাবা সকলকে সমান যত্ন নিয়ে সেবা করত। দেখতে-দেখতে লোকের ভিড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। সাধুবাবার ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। সমস্ত দিন কেবল পুজো আর রোগীদের সেবা করেই দিন কাটাত।

পাঁড়েজির বাড়ির সামনের মাঠে লোকে-লোকারণ্য হয়ে যেত রোজ। এককালে ওই পাঁড়েজি কেবল মামলা-মোকদ্দমা করে উকিল-ব্যারিস্টারের পেট ভরিয়েছে। এখন বুঝতে পেরেছে, ও সব কোনওটাই জীবনে শান্তি দেয় না। বুঝতে পেরেছে যে, চাওয়ার চেয়ে না-চাওয়াতেই বেশি আনন্দ। চাইলে কিছুই পাওয়া যায় না, আর পেলেও তা থাকে না। আর না-চাইলে সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়, আর তাতে যা পাওয়া যায় তার সবটাই থাকে। আর যা থাকে সেই পাওয়াটাই জীবনের আসল পাওয়া। মানুষ যখন মারা যায় তখন সব কিছুই পেছনে ফেলে রেখে যেতে হয়, কিন্তু না-চাইলে যা পাওয়া যায় তা মানুষের সঙ্গে যায়। তা মানুষকে অমরত্ব দেয়। আর আসলে সেইটেই পরম-পাওয়া। সেই পরম-প্রাপ্তির দিকেই পাঁড়েজির মন তখন ঝুঁকেছে।

সাধুবাবা ফুলডাঙায় আসার পর থেকে একেবারে পুরোপুরি বদলে গেছে পাঁড়েজি। গ্রামের লোকও পাঁড়েজিকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। পাঁড়েজি যে এ-রকম মানুষ তা আগে তারা কেউ জানত না। সাধুবাবা ফুলডাঙাতে আসার পর থেকেই পাঁড়েজি বদলে গেছে। যে মানুষ আগে কারো সঙ্গে কথা বলবার সময়ই

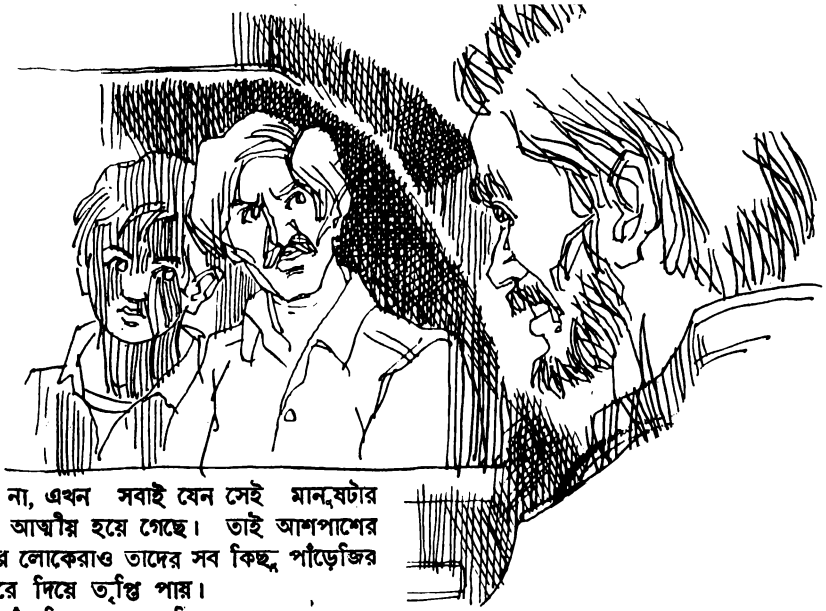

পেত না, এখন সবাই যেন সেই মানুষটার পরম আত্মীয় হয়ে গেছে। তাই আশপাশের গ্রামের লোকেরাও তাদের সব কিছু পাঁড়েজির মন্দিরে দিয়ে তৃপ্তি পায়।

পাঁড়েজিও খুব শান্তি পেয়েছে মনে।

পাঁড়েজি বলে, "আমার কিছুই নয়, সবই সাধুবাবার কৃপা।"

তা হতেও পারে। সবই সাধুবাবার কৃপা। সাধুবাবা ভোর চারটের সময় উঠে ঠাকুরের আরতি শুরু করে। তখন থেকে দলে-দলে ভক্তরা আসতে আরম্ভ করে। আর দূর-দূর থেকে আসে রোগীরা। কেউ পা ভেঙেছে, কারো হাত ভেঙেছে। কারো ছেলে কি মেয়ে মরো-মরো। কারো স্বামী বাতের ব্যথায় নড়তে পারে না। গোরুর গাড়িতে চড়ে কি রিকশায় চেপে আসে তারা। সাধুবাবা সকলকে ওষুধ দেয়, সকলের সেবা করে। সবাই কিছুদিন থেকে সাধুবাবার চিকিৎসায় সেরে উঠে যে-যার বাড়ি চলে যায়। সবাই বলে, "সাধুবাবা আপনি মানুষ নন, দেবতা।"

সাধুবাবা শুধু বলে, "আমি কেউ নই, সবই রামজি! রামজিই তোমাদের ভাল করেছে। তোমরা রামজির ভজনা করো।"

রামজিকে তো কেউ চোখে দেখতে পায় না, সরল গ্রামবাসীরা যাকে চোখের সামনে দেখতে পায় তাকেই তারা প্রণাম করে। প্রণাম করে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায়।

পাঁড়েজি বলে, "আমার কী সৌভাগ্য যে, আপনার সঙ্গে সেদিন ট্রেনে দেখা হয়ে গিয়েছিল, তাই এ-সব হল। নইলে তো আমি পাপে ডুবে যেতুম। আমার তো নরকেও ঠাঁই হত না।"

সত্যিই সৌভাগ্য শুধু দেবদত্তরই নয়, পাঁড়েজিরও। নইলে একদিন যে-আত্মীয়-স্বজনরা পাঁড়েজিকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, তারাই আবার আজ আপন হয়ে গেল। সবই রামজির কৃপা!

সাধুবাবা পুজো সেরে যখন বলে, "জয়, বলো, রামজি কী জয়," সবাই তখন আনন্দে উল্লাসে একসুরে সুর মিলিয়ে বলে ওঠে, "জয়, রামজি কী জয়।"

যে ফুলডাঙা আগে নির্জন নিরিবিলি ছিল, দেখতে-দেখতে আবার সেই ফুলডাঙা যেন ফুলের ডাঙা হয়ে উঠল। দেবুর চোখের সামনেই ফুলডাঙা গ্রামটা ফুলে-ফুলে ভরে উঠল। চারদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। লোকে বলতে লাগল, "ফুলডাঙায় এক নতুন সাধুবাবা এসেছে, সে মানুষ নয়, ভগবান। সে সকলের সব রোগ সারিয়ে দিচ্ছে—"

দেবু জিজ্ঞেস করত, "সাধুবাবা, তুমি কী করে মানুষের এত রোগ সারিয়ে দাও?"

সাধুবাবা হাসতে-হাসতে বলে, "দূর বোকা, আমি কি কারো রোগ সারাই রে, সব রামজির কৃপা।"

"কিন্তু রামজি তো আমাকে ও-ক্ষমতা দেয় না।"

সাধুবাবা বলত, "দেবে দেবে, রামজি কাউকে ছোট মনে করে না। তুইও রামজিকে

ছোটদের যত সেরা বই

শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর সৃষ্ট চরিত্র হর্ষবর্ধনের মতোই, নি ত্য ন তু ন। বাংলা সাহিত্যের হাসির গল্পের ক্ষেত্রে তিনি এক যুগ, এক চিরকালীন চিরনবীন প্রতিষ্ঠান। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এখন তিনি কম লিখছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, এখনও কিছু-কিছু গল্প তবু লিখছেন। সেইরকম কিছু গল্প নিয়েই বেরিয়েছে তাঁর নতুন বই—'লাভের বেলায় ঘণ্টা।' হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনকে নিয়ে লেখা গল্পও যেমন রয়েছে এই বইতে তেমনই রয়েছে নানান মজাদার পরিস্থিতির তীব্র কৌতুককর কাহিনী। প্রতিটি গল্প হাসি-জাগানো, প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র অনাবিল হাসির অনিঃশেষ উৎস।

মনোজ বসু এক দারুণ চরিত্র উপহার দিয়েছেন —ওস্তাদ নটবর। যত রকমের ভূত রয়েছে—টেকো ভূত, কালা ভূত, শঙ্খিনী-শাকচুন্নী, ব্রহ্মদত্যি, পেত্নী, কিম্ভূত, অদ্ভুত—সক্কলে নটবরের কথায় ওঠে বসে। হবে না কেন বলো? নটবর যে মস্ত বড় এক গুণিন। মন্তর-তন্তর, তুক-তাক, তাগা-তাবিজ, গুণ-জ্ঞান—সব তার নখদর্পণে। তাই যত রাজ্যের ভূত-প্রেত আর দৈত্য-দানো তাকে ভয় করে চলে। এহেন নটবরের ভূত-তাড়ানোর সব অদ্ভুত গল্প ও আরও অনেক গল্প নিয়ে অদ্ভুতুড়ে বই—'ওস্তাদ নটবর'। ছোটদের-বড়দের সকলের ভাল লাগবে।

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ যাক্স-রহস্য ৬ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এণ্ড কোং ১০ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৬ সত্যি রাজপুত্র ৬ তিন নম্বর চোখ ৬ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৭ তপন চরিত ৬ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৬ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণমালা ৪ মিতুল নামে পুতুলটি ৫ বাজনা ৬ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৬ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী ১০ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ শরদিন্দু অম্নিবাস ৪র্থ ২০ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার : প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৭ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

একমনে ডাক তাহলে তুইও পারবি!"

"আমি তো তোমার মতো রামজিকে ডাকি, কিন্তু আমার ডাকে তো রামজি সাড়া দেয় না।"

সাধুবাবা বলে, "রামজির কাছে কিছু চাইতে নেই। কিছু চাইলে আর রামজি কিছু দেয় না। শুধু রামজিকে ডাক তুই, কিছু না চেয়ে ডাক, দেখবি তোর ডাকেও রামজি সাড়া দেবে। আমার সেই গানটা তোর মনে নেই?"

বলে সাধুবাবা সেই গানটা আবার গাইত—

"কাম কীয়ে যা, রাম ভজে যা
না কাহুকা ডর হ্যায়,
ইস নগরীমে সভি মুসাফির
না কাহুকা ঘর হ্যায়—"

সাধুবাবার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেবুও গাইত—

"কাম কীয়ে যা রাম ভজে যা....."

সেদিন ফুলডাঙা গ্রামে হঠাৎ একটা বিরাট মোটর-গাড়ি এসে হাজির হল। ফুলডাঙা গ্রামে সাধারণত মোটর-গাড়ি বড় একটা আসে না। বয়েল-গাড়ি আসে, টাঙ্গা আসে, সাইকেল রিকশাও ইদানিং একটা-দুটো আসে। কিন্তু অত বড় মোটর-গাড়ি আগে ফুলডাঙায় কেউ চোখে দেখেনি।

গাড়িটা একজন ড্রাইভার চালাচ্ছিল, ভেতরে একজন ভদ্রলোক বসে ছিল। আর তার পাশে একজন কমবয়েসি ছেলে। ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কোনও রোগে ভুগছে।

একটা চৌমাথার মোড়ে এসে গাড়িটা থামল। থামতেই আশপাশের কয়েকজন লোক এসে গাড়িটাকে ঘিরে ধরল। জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাবেন হুজুর?"

ভদ্রলোক বললেন, "এদিকে ফুলডাঙা বলে কোনও গ্রাম আছে?"

সবাই আগ বাড়িয়ে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ হুজুর, এইটেই তো ফুলডাঙা।"

"তা এখানে একটা মন্দির আছে শুনেছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা মন্দির আছে।"

"আচ্ছা, সেখানে কি কোনও সাধুবাবা আছে? সেই সাধুবাবা নাকি সকলের সব রোগ সারিয়ে দেয়।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন হুজুর। সাধুবাবা সকলের সব রোগ সারিয়ে দেন।"

ভদ্রলোক বললে, "আমি সেই সাধুবাবার কাছেই এসেছি। কত পয়সা লাগে?"

"কিচ্ছু পয়সা লাগে না। একেবারে বিনা পয়সায় সাধুবাবা সকলের রোগ সারিয়ে দেন। তা আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "অনেক দূর থেকে। সাধুবাবার নাম শুনেই আসছি। জায়গাটার নাম মতিহারি।"

"আপনার কী অসুখ?"

ভদ্রলোক বললে, "অসুখ আমার নয়। অসুখ আমার এই ছেলের। আমার এই ছেলের একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।"

গ্রামের লোকরা ইংরিজি বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, "তার মানে?"

ভদ্রলোক বললেন, "তার মানে মোটর-গাড়ি চালাতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছি। কিছুতেই ভাল হয়নি। সব ডাক্তারই বলেছে এই ছেলের পা কেটে ফেলতে হবে।"

গ্রামের লোকেরা বললে, "এই সাধুবাবা সবাইকে ভাল করে দিয়েছেন। আপনার ছেলের পা-ও ভাল হয়ে যাবে।"

গাড়িটাকে আবার চালাতে বললেন ভদ্রলোক।

গাড়ি চলবার আগেই ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে আর কতদূর হবে মন্দিরটা?"

"বেশি দূরে নয়, আর মাইলটাক পথ গেলেই দেখবেন একটা বটগাছ, সেই বটগাছের তলাতেই মন্দিরটা। মন্দিরের পাশেই পাঁড়েজির বাড়ি। সেখানেই সাধুবাবা থাকেন।"

গাড়িটা চলে যাচ্ছিল। কিন্তু গ্রামের লোকের কৌতূহল বড় অদম্য। তারা জিজ্ঞেস করলে, "আপনার নামটা কী হুজুর?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম জেনে আর তোমাদের কী হবে? আমার নাম চন্দ্রভানু চট্টোপাধ্যায়—"

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেতেই গাড়িটা সকলের চোখে-মুখে ধুলো উড়িয়ে সোজা দূরের বটগাছটা লক্ষ করে চলতে লাগল। (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

প্রোটনিয়ার হিপনোটিজম

শান্তনু ভট্টাচার্য

প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল ডঃ ডেভিড তাঁর মোটরে বসে একটার পর একটা সিগার খেয়ে চলেছেন। কেন যে শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরের এই নির্জন মরুভূমির দ্বিতীয় টিলায় স্যার স্টিফেন দেখা করতে বললেন তা চিন্তা করতে করতেই দূরে একটা গাড়ির আলো চোখে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার স্টিফেন গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

"কিছুটা দেরি হয়ে গেল ডেভিড, তুমি হয়তো এভাবে এখানে দেখা করতে বলায় খুবই অবাক হয়ে গেছ।"

স্যার স্টিফেন হাসলেন। তারপর ব্যাগ থেকে একটা যন্ত্র বার করলেন।

"তুমি তো এটা দেখেছ!"

ডঃ ডেভিড দেখলেন স্টিফেনেরই আবিষ্কৃত ইনফ্রা-রশ্মি তৈরির যন্ত্র, রেগুলেটরের মাধ্যমে পাওয়ার বাড়িয়ে দিলে এই রশ্মি পৃথিবীর সব-কিছুই গলিয়ে দিতে পারে।

এবার ব্যাগ থেকে একটা মোটা স্টীলের পাত বার করে বালির ওপর রাখলেন স্যার স্টিফেন, তারপর যন্ত্রটার সুইচ টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাতটা গলে জল হয়ে গেল।

এবার পকেট থেকে একটা ছোট্ট সাদা শিশি বার করে তা থেকে সাদা সাদা গুঁড়ো নিয়ে নিজের হাতের তালুতে খুব ভাল করে মাখিয়ে নিয়ে যন্ত্রটার কাছে তালুটা এগিয়ে দিলেন।

ডঃ ডেভিড আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন। স্যার স্টিফেন একটু হেসে যন্ত্রটা বন্ধ করে হাতটা এগিয়ে দিলেন ডেভিডের দিকে।

"কিছু বুঝলে?"

অবাক বিস্ময়ে ডঃ ডেভিড লক্ষ করলেন হাতের কোনো ক্ষতি হয়নি।

"বুঝলে ডেভিড, আমার নবতম আবিষ্কার।" শিশিটা তুলে দেখালেন।

"এখনও নাম কিছু দিইনি, মনে করো নাও 'এক্স'। তবে এর ক্ষমতা দেখলে তো? ইনফ্রা-রশ্মিও একে পোড়াতে পারে না। শিশিতে আর একটুও 'এক্স' নেই, থাকলে তোমার ওপরেও পরীক্ষা চালানো যেত। তবে সমস্ত ফরমুলা আমি টেপ করে রেখেছি।"

ডঃ ডেভিড অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু স্যার, এ জিনিসটা মানুষের উপকারে আসবে কীভাবে?"

স্যার স্টিফেন পায়চারি করতে করতে বললেন, "দেখ ডেভিড, পৃথিবীর জন্ম-লগ্ন থেকে সূর্য আমাদের আলো ও তাপ দিয়ে আসছে। কিন্তু ক্রমাগত তাপ ক্ষয় হতে হতে সূর্যও কিন্তু শেষ হয়ে আসছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্য থেকে হিলিয়াম গ্যাস ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে কেউই বাঁচাতে পারবে না, তবে পৃথিবীর যা অবস্থা তাতে অনেক আগেই হয়তো মানুষকে অন্য সৌরমণ্ডলে স্থান করে নিতে হবে। তাই তো আজ গ্রহ-অভিযান শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এতে মানুষের একটা বিপদ আছে। আমরা জানি আমাদের জানা নক্ষত্রগুলোর মধ্যে সূর্যই সবচেয়ে ছোট নক্ষত্র। কাজেই অন্য সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোতে তাদের দানব-সূর্যগুলোর তাপ অনেক বেশি, তখনই আমার আবিষ্কৃত 'এক্স' মানুষের কাজে আসবে। অবশ্য, 'এক্স'-এর তখন আরও উন্নতি ঘটবে।"

ডঃ ডেভিড বললেন, "কিন্তু স্যার কোনো যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের হাতে এ-জিনিস পড়লে তারা হয়তো এটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করবে।"

"তারা জানবে কী করে? আমি খুব গোপনে এটা আবিষ্কার করেছি, ফরমুলাও কোনো কাগজে লিখে রাখিনি। টেপরেকর্ডে তুলে ক্যাসেটটা আমার লকারে রেখে এসেছি। চলো যাওয়া যাক, কাল তুমি ল্যাবরেটরিতে এসো, আরও কিছুটা 'এক্স' তৈরি করে পরীক্ষা করে দেখব।"

দুটো গাড়ি আবার রাতের অন্ধকারে শহরের দিকে ফিরে চলল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ল্যাবরেটরিতে গিয়ে লকার খুলে টেপটা বার

করলেন স্টিফেন। ক্যাসেটটা রেকর্ডারে লাগিয়ে তাড়াতাড়ি চালিয়ে দিলেন। আস্তে আস্তে টেপ চলতে শুরু করল...

"আমি স্যার স্টিফেন, আজ ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর 'এক্স' আবিষ্কারের ফরমুলা বলছি। এই ফরমুলা একদিন মানুষের প্রচন্ড উপকারে আসবে"...

স্যার স্টিফেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ও'র প্রিয় ছাত্র ডঃ ডেভিডকে ফরমুলাগুলো বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

হঠাৎ একটা রক্ত-হিম-করা গমগমে হাসি। স্টিফেন অবাক হয়ে চারিদিকে তাকালেন। শেষে বুঝতে পারলেন যে, হাসির আওয়াজটা রেকর্ডার থেকেই আসছে। হঠাৎ হাসি বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার স্যার স্টিফেনেরই গলা ভেসে এল। কিন্তু এসব কী আবোল-তাবোল বকছেন তিনি? স্টিফেনের মনে হল, স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

টেপ বেজে চলেছে—"এক্স আর মানুষের কোনো উপকারেই লাগবে না, কারণ সমস্ত ফরমুলা আমি মুছে দিচ্ছি। অবশ্য এ সৌর-মন্ডলের বাসিন্দা আমি নই, একশো-আলোক-বর্ষ দূরের প্রোটানিয়া গ্রহের জীব। আমাদের আকাশে দুটো সূর্য জাফ্ফা আর জিল্লা, দুটোই তোমাদের সূর্য থেকে অনেক বড়। তোমাদের চিন্তা ছিল একদিন পৃথিবী থেকে মানুষ অন্য সৌরমন্ডলে গিয়ে বসবাস করবে। হয়তো আমাদের গ্রহে গিয়ে পৌঁছবে কোনোদিন এবং তোমার আবিষ্কৃত 'এক্স'-এর গুণে ওখানকার প্রচন্ড তাপ সহজেই সহ্য করতে পারবে। কাজেই সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধবেই. সেই সংঘর্ষ এড়াতেই 'এক্স'-এর ফরমুলা নষ্ট করতে আমি বাধ্য হলাম।

"এবার তোমার প্রশ্ন, কী করে এসব করলাম। দ্যাখো, তোমাদের বিজ্ঞান আমাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। তোমরা যেমন নানা উপগ্রহ পাঠিয়ে, স্কাইল্যাব তৈরি করে, মহাকাশ স্টেশন তৈরি করে মহাকাশের অনেক রহস্যের সন্ধান পাচ্ছ, আমরাও তেমনি বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে হাজার হাজার আলোকবর্ষ-মহাকাশপথের মধ্যে যা-কিছু ঘটে চলেছে সব জানতে পারছি। তোমাদের উন্নতি আমরা গভীর আগ্রহে লক্ষ করে চলেছি। কাল রাত্রে যখন ডঃ ডেভিডকে 'এক্স' পরীক্ষা করে দেখলে, তারপর ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লে, তখন ইথারতরঙ্গের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রে'র সাহায্যে তোমার চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তাকে যোগ করে দিলাম।

"আসলে যখন তুমি কিছু চিন্তা করো তখন কতকগুলো ওয়েভ তোমার ব্রেন থেকে বেরিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। আর যখন তুমি ঘুমোও তখন এটা তোমার ব্রেনের চারপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, তখন সহজেই ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রে'র সাহায্যে তোমার চিন্তা-শক্তিকে আমার চিন্তাশক্তিতে পরিবর্তিত করে নিয়েছি। কিছু মানুষের ব্রেনও অবশ্য ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ ছড়িয়ে দিতে পারে, এবং তার চিন্তাকে এইভাবে তোমার ওপর চাপিয়ে দিতে পারে। যাকে তোমরা হিপনোটাইজ করা বলো। আমিও অনেকটা প্রায় ঐ ফরমুলাতেই তোমার ঘুমের মধ্যে তোমাকে দিয়েই 'এক্স'-এর ফরমুলাগুলো নষ্ট করিয়ে, এই কথাগুলো বলিয়ে নিলাম। বিদায় পৃথিবীবাসী, বিদায়।"

ছবি দেবাশিস দেব

সেয়ানে সেয়ানে

(তামিলনাড়ুর উপকথা)

আরতি দাস

আকবর বাদশার আমলে তামিলনাড়ুর একজন ব্যবসায়ী দিল্লিতে বসবাস করত।

লোকটির নাম গঙ্গাবন্ধুলু। আমদানি রফতানির ব্যবসা চালিয়ে প্রচুর রোজগার হত ওর। একবার গঙ্গাবন্ধুলুর খুব ইচ্ছে হল যে, বারাণসীতে তীর্থ করতে যাবে। কিন্তু হিরে-মুক্তোর কিছু দামি গয়না আছে ঘরে, সেগুলো কার কাছ রেখে যাবে ও?

গঙ্গাবন্ধুলু একা মানুষ। দিল্লিতে তেমন কোনো আত্মীয়-বন্ধুও নেই, যার কাছে দামি জিনিস রাখা যেতে পারে। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে ঠিক করল, আবদুলের কাছেই রেখে যাবে। বন্ধু না হলেও অনেক-দিনের চেনাজানা। আবদুল নিশ্চয় ঠকাবে না।

বারাণসী থেকে ফিরে এসেই গয়না ফেরত পাবে এই শর্তে অলঙ্কারগুলো আবদুলের কাছে রেখে তীর্থ করতে চলে গেল গঙ্গাবন্ধুলু। সে-সময় এখনকার মতো ট্রেন বা প্লেনের চল ছিল না। যাতায়াতে সময় লাগত অনেক। বেশ কিছুদিন পরে বারাণসী থেকে ফিরল গঙ্গাবন্ধুলু। তারপর আবদুলের সঙ্গে দেখা করে বলল, "আমার গয়নাগুলো এবার ফেরত দাও।"

এ-কথা শুনেই আবদুল যেন আকাশ থেকে পড়ল। খুব অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "আমার কাছে! আমার কাছে কবে আবার গয়না রাখলে তুমি? কই, সে-রকম কোনো কথা তো মনে পড়ছে না। যাও বাপু, আর দিক কোরো না। এখন হাসিতামাশার সময় নয়। আমি ভীষণ ব্যস্ত। নিজের বাড়ির রাস্তা দেখ তুমি।"

বারবার বলেও যখন কোনো ফল হল না, তখন নিরুপায় গঙ্গাবন্ধুলু আকবর বাদশার কাছে গেল। বাদশাহকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে আর্জি জানাল, "হুজুর, আমি যাতে দামি গয়নাগুলি ফেরত পাই তার ব্যবস্থা করুন।"

সব শুনে আকবর বাদশা একজন মন্ত্রীকে ডেকে এ কাজের ভার দিয়ে বললেন, "যে করেই হোক গঙ্গাবন্ধুলু যেন ওর জিনিস ফেরত পায়।"

পরদিন গঙ্গাবন্ধুলুকে ডাকিয়ে এনে মন্ত্রী বললেন, "কাল রাত নটার সময় তুমি আবদুলের বাসায় যাবে। আমি থাকব ওখানে। কোনোরকম রাগের কথা না বলে তুমি সরাসরি বলবে, 'আমি বারাণসী থেকে ফিরেছি। এবারে আমার জিনিসগুলি ফেরত দাও।' ব্যস, এর বেশি আর একটি কথাও নয়। তাহলেই তুমি সব জিনিস ফেরত পাবে।"

পরদিন সকালবেলায় মন্ত্রী আবদুলের বাসায় চলে গেলেন। বললেন, "আবদুল, অনেক দিন থেকেই ভাবছি পরিবারের সবাইকে নিয়ে একবার রামেশ্বর সেতুবন্ধ যাব। কিন্তু খালি বাড়িতে আমার টাকাকড়ি

ধনরত্ন রেখে গেলে চুরি যাওয়ার ভয় আছে। তাই ঠিক করেছি, সব কিছু তোমার বাসায় রেখে যাব।"

একটু থেমে বললেন, "দিল্লি শহরে আমার অনেক চেনাজানা লোক আছে, কিন্তু তোমার বাড়ির মতো এমন মজবুত বাড়ি নয় তাদের। তাই এখানে রাখলেই সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

বাদশার মন্ত্রী। সেই মন্ত্রীর সমস্ত টাকাকড়ি, ধনরত্ন! তার মানে লাখ-লাখ মজুত টাকা আর হিরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি! চতুর আবদুল তখনই রাজি হয়ে গেল। বলল, "একটি বাক্সে সমস্ত ভর্তি করে বাক্সটি আমার কাছে পৌঁছে দেবেন, তাহলেই হবে। পরে যখন আপনি বা আপনার পাঠানো লোক এসে চাইবে তক্ষুনি ফেরত দিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে। আজ রাত আটটার সময় বাক্সটি পৌঁছে দেব তোমাকে।" এ-কথা বলে মন্ত্রী বাড়ি ফিরে গেলেন।

রাত আটটায় আবার এলেন মন্ত্রী। সঙ্গে তালাবন্ধ এক বিশাল বাক্স। অত বড় বাক্স দেখে আবদুলের আনন্দ আর ধরে না। খুব খাতির-টাতির করে মন্ত্রীকে বৈঠকখানায় বসাল। মন্ত্রীও ধীরেসুস্থে নানা কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় গঙ্গাবন্ধুলু এসে হাজির। মন্ত্রীকে যেন দেখতেই পায়নি এমন ভাব করে গঙ্গাবন্ধুলু বলল, "এই যে আবদুল, আমি বারাণসী থেকে ফিরেছি। আমার জড়োয়া গয়নাগুলি ফেরত দিয়ে দাও ভাই।"

কোনো কথা না বলে ভেতরে চলে গেল আবদুল। সব গয়না গঙ্গাবন্ধুলুর হাতে তুলে দিয়ে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখলেন তো, অনেকদিন আগে আমার কাছে এ-সব রেখে তীর্থে গিয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই আপনার আস্থা বাড়ল আমার ওপরে। আপনার জিনিস খোয়া যাওয়ার কোনো ভয় নেই।"

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই না। আমার সব ধনরত্ন এই বাক্সে ভর্তি করে রেখে যাচ্ছি। জানি, তুমি খুব যত্ন করে রাখবে।"

নিজের জিনিস বুঝে পেয়ে গঙ্গাবন্ধুলু চলে যাওয়ার পরে মন্ত্রীও উঠে পড়লেন। বাদশার হুকুমমতো কাজটা করতে পেরেছেন বলে খুশিমনে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরদিন সকালে গঙ্গাবন্ধুলু গয়না ফেরত পেয়েছে শুনে আকবর বাদশা খুব খুশি হয়ে সেই মন্ত্রীকে অনেক পুরস্কার দিলেন।

ওদিকে হয়েছে কি, সেই রাত্রে মন্ত্রী চলে যাওয়ার পরেই প্রকাণ্ড বড় বাক্সটি সামনে নিয়ে বসল আবদুল। পুরনো কাঠের বাক্স। তা হোক্‌গে, ভেতরে তো লাখ-লাখ টাকার জিনিস!

একটা লোহার শলা ঢুকিয়ে চাপ দিতেই তালাটা ভেঙে গেল। চটপট বাক্সের ডালা তুলে ভেতরে উঁকি দিয়েই একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসল আবদুল।

হিরে-মুক্তো, সোনাদানা দূরে থাক, একটা কানাকড়িও নেই। অত বড় বাক্সটা শুধু মাটির টুকরো দিয়ে ভর্তি।

ছবি দেবাশিস দেব

যাচ্ছেটা কে

অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

তপ্ত দুকুর
শুকোয় পুকুর
রোদের চাঁটি
ফাটছে মাটি
মামার-বাড়ি
তেঁতুলমারি
অনেক দূরে
ভরদুপুরে
যাচ্ছেটা কে
চশমা-নাকে ?
যাচ্ছে খোকা
মাথায় টোকা
চশমাটা কার ?
হাবুলকাকার।

ছবি দেবাশিস দেব

ছবির মজা

ছবিটায় রঙ-পেনসিল বুলোবার আগে লুকোনো তিনটি বোতাম তোমার ছোট্ট ভাইকে খুঁজে বার করতে বলো।

ছবিগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। কার সঙ্গে কার যোগ, বলো তো ?

ক+ছ, খ+চ, গ+ঘ (নোয়ার নৌকো), ঙ+জ

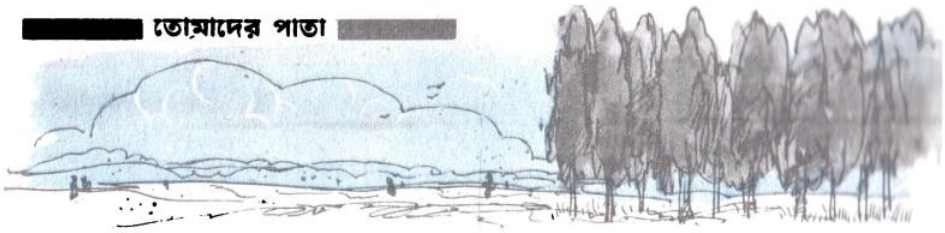

দীঘায় কিছুক্ষণ

কিছুদিন আগে আমরা কাঁথিতে ছোট-দাদুর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন গাড়িতে আমরা জুনপুট গেলাম। জুনপুটে ঘন ঝাউয়ের বন। এখানে সমুদ্র অনেক দূরে। বড়-বড় জাল শুকোতে দেখলাম।

বাতাসে শুটকি মাছের গন্ধ। এখানে সমুদ্রের বালিতে আমি, বাপ্পাকাকু, বুলবুল পিসি অনেক সুন্দর-সুন্দর ঝিনুক আর শামুক কুড়োলাম। ওখান থেকে আমরা দীঘা রওনা হলাম।

দীঘাতে সমুদ্রকে খুব ভালভাবে দেখতে পেলাম। এর আগে আমি সমুদ্র দেখিনি। বইতে পড়েছি সমুদ্র বিরাট, ভয়ংকর তার ঢেউ।

দীঘায় সমুদ্র কিন্তু খুব শান্ত। অনেকক্ষণ পর-পর ছোট-ছোট ঢেউ ওঠে। দুপুরে আমরা সমুদ্রে স্নান করতে গেলাম। প্রথমে আমার খুব ভয় করছিল। কিন্তু জলে নামার পরে ভয় ভেঙে গেল। স্নান করতে গিয়ে আমি অনেক জল খেয়েছিলাম। তারপর ঝাউবনে বসে আমরা টিফিন খেলাম। বাবা আমাদের অনেক ছবি তুলেছিলেন।

বিকেলে সমুদ্রের ধার দিয়ে গাড়িতে করে আমরা অনেকক্ষণ ঘুরে এলাম। এখানে বালিতে অসংখ্য ছোট-ছোট লাল কাঁকড়া। আমরা যেই ওদের ধরতে যাই অমনি ওরা গর্তে ঢুকে যায়। আমাদের খুব মজা লাগছিল।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধের পর আকাশে বিরাট চাঁদ উঠল। তারপর সমুদ্রে জোয়ার এল। সমুদ্রের গর্জন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়-বড় ঢেউগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

জ্যোৎস্নার আলো সমুদ্রের জলকে রুপোলি করে তুলছিল। আমরা অনেকক্ষণ ধরে সেই মনোরম দৃশ্য দেখে রাত্রে কাঁথি ফিরে এলাম।

মনোজিৎ মিত্র (বয়স ১২)

ছবি এঁকেছে **রাজর্ষি মিত্র** (বয়স ৯)

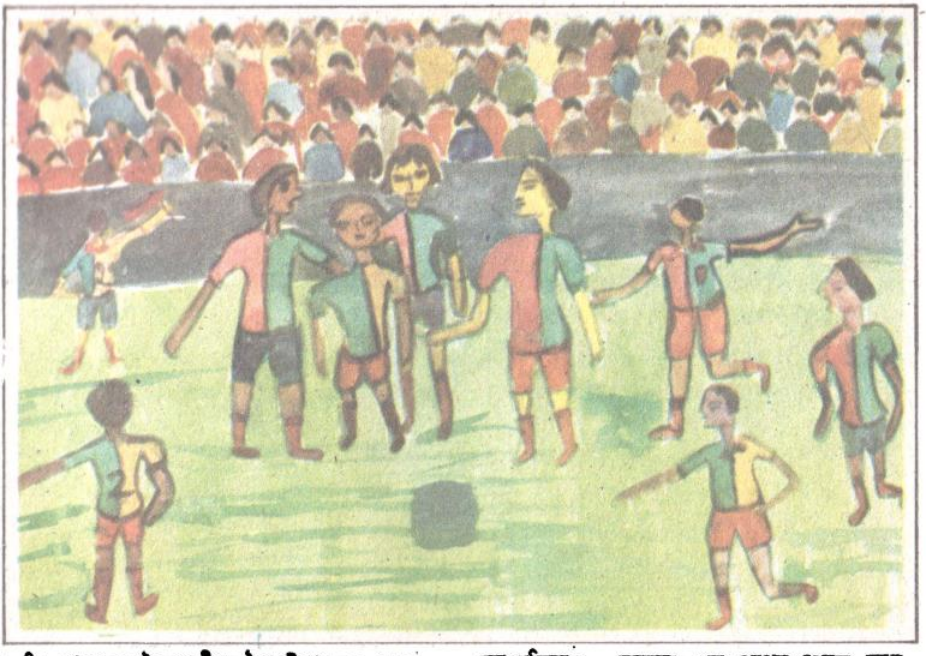

ছবি এঁকেছে **চৈতালী চৌধুরী** (বয়স ১১)

জলপ্রপাতে

আমি কিছুদিন আগে আমাদের গিরিডির বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওখানে পিসিরাও ছিল। খুব মজা হল। একদিন ঠিক করা হল, উশ্রীর জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া হবে।

দুপুরবেলা আমরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যাত্রা শুরু করলাম। ওখানে পৌঁছলাম বিকেলে। জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমরা এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে গিয়েছিলাম। উঁচু-নিচু পাথরের ধাপে-ধাপে জল গর্জন করছিল। এক জায়গায় উশ্রীর জল প্রায় একশো ফুট ওপর থেকে পড়ছিল। আমার ক্যামেরায় ওই ছবি তুলে নিলাম।

ওখানেও অনেকে পিকনিক করছিল। আমরা যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হব-হব করছে।

প্রসেনজিৎ মিত্র

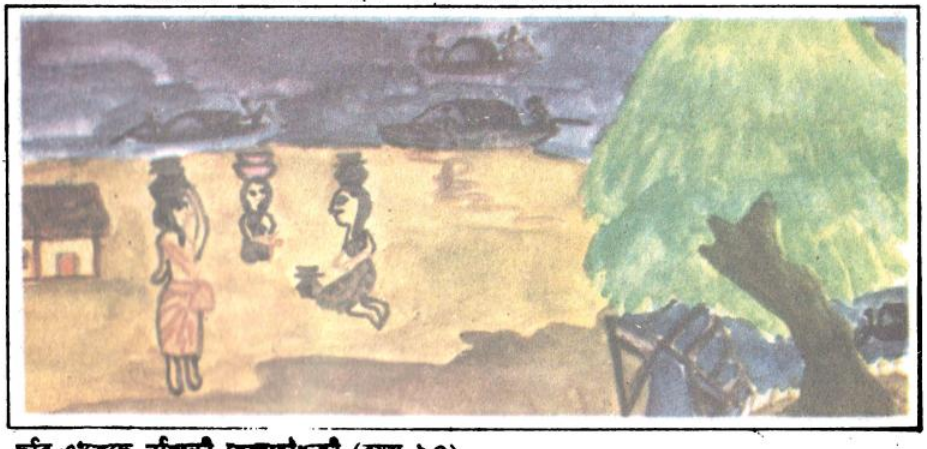

ছবি এঁকেছে **নন্দিনী ভৌমিকচৌধুরী** (বয়স ১০)

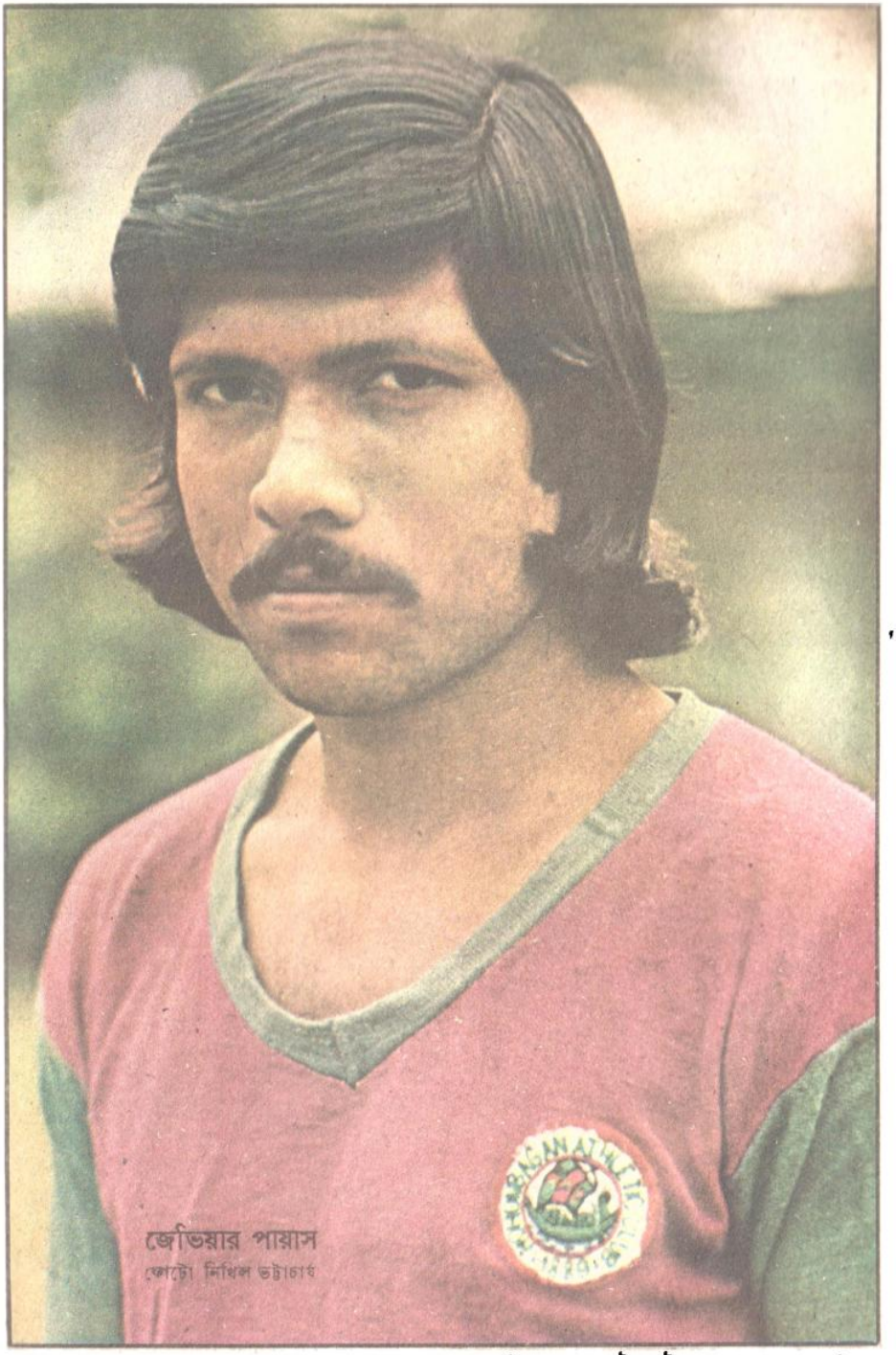

জেভিয়ার পায়াস
ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

(পাতা ওলটালেই পায়াসের খবর)

পায়াস বাংলাকে ভালবেসেছে

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

তিন বছর আগের কথা। প্রথম ফেডারেশন ফুটবল কাপের খেলা চলছে কোচিনে। কেরলের অন্যতম শক্তিশালী দল প্রিমিয়ার টায়ার্স খেলছে বোম্বাইয়ের নামী দল টাটা স্পোর্টসের বিরুদ্ধে। তেরো মিনিটের মধ্যেই প্রিমিয়ার পিছিয়ে গেল তিন গোলে। তিনটি গোলই সাব্বির আলির, যে-সাব্বির গত বছর ইস্ট-বেঙ্গলে দারুণ খেলার পর এবার মহামেডান স্পোর্টিংয়ে এসেছেন।

এই 'হারা' ম্যাচটি কিন্তু সেদিন বাঁচিয়ে পরের খেলায় জিতেছিল প্রিমিয়ার টায়ার্স। শেষ গোল যখন শোধ হল তখন খেলা শেষ হতে বাকি ছিল মাত্র তিরিশ সেকেণ্ড। ঐ গোলটি এবং প্রথম গোলটি করেছিল কেরলের আলিঙ্গান অঞ্চলের একটি শ্যামবর্ণ, লাজুক, স্বল্পবাক ছেলে। তার পায়ে যেমনি কিক, মাথায় সেইরকম বুদ্ধি। পরে ছেলেটি কল-কাতায় খেলে গেছে। সন্তোষ ট্রফিতে কেরলের হয়ে। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে কেরলের সেই অবিস্মরণীয় খেলাটিতে, যাতে কেরল শেষ পর্যন্ত ৩—৪ গোলে হেরে যায়। ছেলেটি সে-খেলায় একটি চমৎকার গোল করেছিল। শুধু তাই নয়, অন্য প্রতিটি খেলাতেই সে ভাল খেলেছিল। সেবার কেরল সন্তোষ ট্রফি পায়নি বটে, কিন্তু ছেলেটি ও তার দলের অন্য কয়েকজন দেশে ফিরে গেল কলকাতাকে জিতে। কলকাতাবাসীর হৃদয়। যা-ই হোক, গত বছর তাকে আবার ফিরে আসতে হল কলকাতায়। মোহনবাগানের টানে। মধ্যে অবশ্য ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে সে খেলে এসেছিল। এত কথার পর নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না যে, এই ছেলেটিই জেভিয়ার পায়াস, যে-স্ট্রাইকারটির উপর মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও সমর্থকদের আশা-ভরসা অগাধ।

গত বছর লীগ শুরুর আগে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বুঝেছিলোম ঐ আশা-ভরসার কথা পায়াস জানে খুব ভালভাবেই। বলল, "কতটা সফল হব জানি না। তবে আমার তরফে প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টার ত্রুটি ঘটবে না।"

তারপর অনেক কিছু হয়ে গেছে। লীগ, আই এফ এ শীল্ড, গোল্ড কাপ, ডুরাণ্ড—সবই মোহনবাগান তাঁবুতে নিশ্চিন্ত, নিরা-পদ আশ্রয় পেয়েছে। হয়তো বা রোভার্সও আসত, কিন্তু ঘটনাচক্রে মোহনবাগান ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। বলা বাহুল্য, প্রতিটি সাফল্যেই পায়াসের অবদান ছিল অসামান্য। বিশেষত শীল্ড ফাইনালে পায়াসের সেই প্রতিপক্ষ ডিফেন্স-তছনছ-করা খেলার কথা কি কেউ ভুলতে পেরেছি এখনও?

একের পর এক নতুন সম্মানের মুকুট উঠেছে পায়াসের মাথায়। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলে, পশ্চিম এশিয়ায় শুভেচ্ছা-সফরকারী ভারতীয় দলে আর সিঙ্গাপুরে প্রাক-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলে তার স্থান পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি কোনওরকম। আর এ-বার দল-বদলের সময় ইস্টবেঙ্গল-সমর্থকরা যে স্ট্রাইকারটিকে পেতে চেয়েছিলেন, তিনি পায়াসই।

সে-কথা যাক্। বলছিলাম পায়াসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা। মনের কথা-গুলো বলার সময় জুনের সেই সকালে অনুশীলনক্লান্ত পায়াসকে বড় বেশি সিরিয়াস দেখাচ্ছিল। মুখে চোখে ছিল এক নিটোল আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। প্রসঙ্গ হাল্কা করার জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম, "তুমি কলকাতায় এলে কেন?" উত্তর হল, "ভাল ফুটবল খেলার জন্যে। আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে।"

মোহনবাগানেই বা কেন? পিতৃদেব এ এম জেভিয়ার-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অবশ্য ফুটবলে 'উৎসাহ দেওয়া' যাকে বলে গোড়ায় ওর বাবা-মা তা করেননি। সত্যি কথা বলতে কী, এ-সম্পর্কে তাঁদের একটু ভয়ই ছিল। তাই ওর ছেলেবেলা থেকেই ফুটবল-অনুরাগ লক্ষ করে তাঁরা মৃদু অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, 'খেলছ খেলো, কিন্তু পড়াটাও সঙ্গে সঙ্গে করে যাও। ওখানে ফাঁকি দিলে ভবিষ্যতে নিজেই পস্তাবে।'

কিন্তু ভবিতব্যকে খণ্ডন করতে পারে কি কেউ? তাই কিছুদিন দুটি সমান্তরালভাবেই

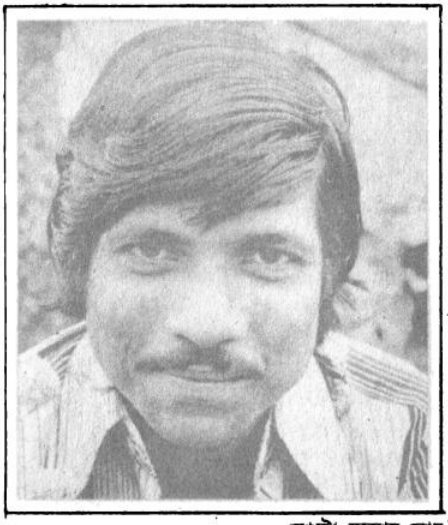

ফোটো সন্তোষ ঘোষ

চললেও শেষ পর্যন্ত ফুটবলেরই জিত হল। প্রিমিয়ার টায়ার্সের খেলোয়াড় বিজয়ন, যিনি পরে ওখানকার প্রশিক্ষক হয়েছিলেন, দলে টেনে নিলেন পায়াসকে। প্রথম কয়েকটি বছর প্রিমিয়ারেই কেটেছে। পায়াস ফুটবলের প্রথম পাঠ নিল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের এখনকার প্রশিক্ষক টি এ রহমানের কাছে। রহমানের ঋণ পায়াস কোনোদিন ভুলবে না।

আর একজন পায়াসের খুব প্রিয়। এবং শ্রদ্ধেয়। হাবিব।

পায়াসের স্মরণীয় খেলা কোনটি ?—'অন্য লোকে কী বলবে জানি না, তবে আমার নিজের কাছে ফেডারেশন কাপের সেই খেলাটি।' যে খেলার কথা এই সাক্ষাৎকারের শুরুতেই বলেছি।

একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না—কৌতূহলই জয়ী হল। জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি কী খাও এখানে? তোমার রাজ্যের খাবার না আমাদের ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'হোয়াই, আই টেক বেঙ্গলি ফুড। আই লাইক ইট।'

শুধু এখানকার খাবারই নয়। পশ্চিমবাংলাকেই ভালবেসে ফেলেছে পায়াস। কারণ? তার দেশের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার নানা দিক থেকে প্রচুর মিল আছে যে। 'ব্যাপারটা কী? এখানে পাকাপাকিভাবে থাকার কথা চিন্তা করছ নাকি ?' জিজ্ঞেস করলাম আবার।

একটু লাজুক হেসে উত্তর দিল, 'না না, ওসব চিন্তা এখনও কিছু করিনি।'

ওরা একুশজন

মণীশ মৌলিক

জীবনে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করা একটা দারুণ ব্যাপার। কিন্তু জীবনের প্রথম টেস্টে নয়, প্রথম সেঞ্চুরি করতে গিয়ে দুশো বা তারও বেশি রান করাটা হয়তো আরও রোমাঞ্চকর। আজ পর্যন্ত মাত্র একুশজন এই ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনার নায়ক হয়েছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গারফিল্ড সোবার্স তাঁর ছাব্বিশটি টেস্ট সেঞ্চুরির মধ্যে প্রথম সেঞ্চুরিটি করতে গিয়েই বিশ্বরেকর্ড করেছেন। ১৯৫৮ সালে জামাইকার সাবিনা পার্কে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সোবার্সের অপরাজিত ৩৬৫ রান ব্যক্তিগত রানসংগ্রহের নয়া নজির।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আরও পাঁচজন এই সম্মানের অধিকারী। ১৯৫০ সালে রোহন কানহাই কলকাতায় তৃতীয় টেস্টে জীবনের

গারফিল্ড সোবার্স

প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন ১৩টি টেস্ট খেলার পরে। তাঁর রানসংখ্যা ছিল ২৫৬। সেমুর নার্স এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে '৬৫ সালে। বারবাডোজের ব্রিজটাউনে চতুর্থ টেস্টে নার্স ২০১ রান করেছিলেন। ডি অ্যাটকিনসন সারা জীবনে একটাই মাত্র সেঞ্চুরি করতে পেরেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে '৫৫ সালে ব্রিজটাউনে চতুর্থ টেস্টে তিনি ২১৯ রান করেছিলেন।

১৯৭১-৭২ সালে লরেন্স রো প্রথম আবির্ভাবেই নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জামাইকার সাবিনা পার্কে প্রথম ইনিংসেই ২১৪ রান করেছিলেন। আর এই তো সেদিন, ১৯৭৮-'৭৯ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেখ ফাউদ ব্যাকাস কানপুরে প্রথম সেঞ্চুরি করলেন। ব্যাকাস সে ইনিংসে চোখ-ঝলসানো ২৫০ রান করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের মোট পাঁচজন ব্যাটসম্যান এই ধরনের কৃতিত্বের অধিকারী হতে পেরেছেন। ডব্লু জে এডরিচ '৩৯ সালে ডারবানের কিংসমেতে দ্বিতীয় ইনিংসে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২১৯ রান করেছিলেন। ১৯০৩-১৯০৪ সালে ফস্টার একমাত্র সেঞ্চুরি করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনিতে। তিনি করেছিলেন ২৮৭ রান। টেস্টে বাইশটি শতরানের অধিকারী ইংল্যাণ্ডের ওয়ালি হ্যামণ্ড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনিতে '২৮-'২৯ সালে প্রথম সেঞ্চুরি করেন। তাঁর ইনিংস শেষ হয়েছিল ২৫১ রানে। ১৯৭৪ সালে বার্মিংহামে ওপেনিং ব্যাটসম্যান ডেভিড লয়েডের অপরাজিত ২১৪ রানের সঙ্গেই আসে প্রথম এবং একমাত্র সেঞ্চুরি। ১৯৩৮ সালে এল পেণ্টার নটিংহামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২১৬ রানে নট-আউট ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার মাত্র তিনজন এই সম্মান লাভ করেছেন। প্রাক্তন অধিনায়ক ববি সিম্পসন ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে '৬৪ সালে প্রথম তিন অঙ্কের রান সংগ্রহ করেন। সেই তিন অঙ্কের রান সংগ্রহ শেষপর্যন্ত গিয়ে ঠেকে ৩১১তে। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সিডনিতেই গ্রেগরি প্রথম সেঞ্চুরি লাভ করেন ১৮৯৪-৯৫ সালে। গ্রেগরির সেই

ইনিংস শেষ হয়েছিল ২০১ রানে। বার্নসও প্রথম সেঞ্চুরি (দ্বিশতাধিক রান) পান ওই সিডনিতে এবং সেটিও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে (১৯৪৬-৪৭ সালে)।

এছাড়া প্রথম তিন অঙ্কের রান সংগ্রহ করতে গিয়ে দুশো বা তারও বেশি রান করেছেন বিশ্বের আরও সাত জন ব্যাটসম্যান। তার মধ্যে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুজন, পাকিস্তানের তিনজন, ভারতের একজন ও নিউজিল্যান্ডের একজন। উইকেটকীপার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ইমতিয়াজ আমেদও এই সম্মান অর্জন করেছেন। ১৯৫৫-'৫৬ সালে লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি ২০১ রান করেছিলেন। পাকিস্তানের 'রান-মেশিন' জাহিরের টেস্ট-জীবনে সেঞ্চুরির শুভসূচনা হয়েছিল '৭১ সালে বার্মিংহামে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি ২৭৪ রান করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে এম ডোনেলির লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মন্থর ২০৬ রান আলোচ্য ক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের একমাত্র কৃতিত্ব। ভারতের পক্ষেও এই কৃতিত্বের অধিকারী মাত্র একজন—দিলীপ সরদেশাই। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্নে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে '৬৫-তে তিনি অপরাজিত থেকে দুশো রান করেছিলেন। তাঁর জীবনে সেই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডি ম্যাকগ্লিউ এবং এ নর্সও এই কৃতিত্বের অধিকারী। মারকুটে ম্যাকগ্লিউ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়েলিংটনে অপরাজিত থেকে ২৫৫ রান করেছিলেন। জোহান্সবার্গে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০১ রানই ছিল নর্সের জীবনের প্রথম তিন অঙ্কের সাফল্য। ১৯৮০-তে এই তালিকায় যে নামটি সংযোজিত হল, তিনি পাকিস্তানের উইকেট-কীপার তসলিম আরিফ। ফৈসলাবাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তসলিমের নট-আউট ২১০ রানই তাঁকে প্রথম তিন অঙ্কের সাফল্য এনে দেয়। সেই সঙ্গে অনন্য সম্মান।

মজিদ

গোলের লড়াই

অশোক দাশগুপ্ত

চমকে গেলেন বিদেশ বসু। পায়ে অমন আঘাত নিয়ে খেলা যায়? কয়েক মিনিট আগে ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিংকে টাই ভেঙে হারিয়েছে মোহনবাগান। ভাস্কর গাঙ্গুলির পায়ের অবস্থা দেখে মিহির বসুও চমকালেন। ঐ যন্ত্রণার মধ্যেও ভাস্কর বললেন, "আজ গোলটা দারুণ করেছিস মিহির। কাল ফাইনালেও ভাল খেলা চাই।" ব্যাপারটা যেন সকালবেলার চা খাওয়ার মতোই সহজ এবং স্বাভাবিক—মিহির বললেন, "কালও গোল করব ভাস্কর, দেখে নিস।"

সাতাত্তরে লীগ ম্যাচে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অলৌকিক গোল করার পর মাঝে-মাঝেই জেগে উঠেছেন মিহির। আটাত্তরের ডুরান্ড ফাইনাল, বরদলুই ফাইনাল আর আরারাতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচের

মিহিরকে কে ভুলতে পারে। গত বছরের মেঘ সরিয়ে এবার ফের আলো ছড়ালেন বাংলার এই তরুণ স্ট্রাইকার। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথম সুযোগেই গোল করেছিলেন। তিন বছর পর, মোহনবাগানের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও প্রথম সুযোগেই গোল করলেন। তবে কি এবার কলকাতা লীগে টপ স্কোরার হবেন মিহির বসু?

কেন, গত বছরের জয়েন্ট টপ স্কোরার মানস ভট্টাচার্য আর সাব্বির আলি কি খেলা ছেড়ে দিয়েছেন? মানস এখনও একটু গুটিয়ে, ফেডারেশন কাপে গোলটোল পাননি—কিন্তু একবার গোল করা শুরু করলে কোথায় থামবেন কেউ বলতে পারে? সাব্বির ফেডারেশন কাপে তিনটি গোল করেছেন। আর মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথম সেমিফাইনালে আকবরের সেন্টার থেকে তার যে হেডটি পোস্টে ছোবল মারল—তাতে গোল না থাকলেও লীগে অনেক গোলের সম্ভাবনার কথা লেখা ছিল। সাব্বিরের মাথা থেকে পাশের লোকটির পায়ের দিকে চোখ ফেরাও। তার মাথার ছোবলও মারাত্মক, তবে এবার তিনি পায়েই স্থান দিয়েছেন বেশি। পুরো এক বছর চোট নিয়ে বসে থাকার পর মহম্মদ আকবর দারুণভাবে ফিরে এসেছেন হয়তো একটি রেকর্ড ভাঙার জন্য। কলকাতা লীগে চারবার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন অতীতের দুর্দান্ত সেন্টার ফরোয়ার্ড সাহু মেওয়ালাল। উনিশশো আটাত্তরেই সেই রেকর্ড ধরে ফেলেছেন আকবর। এবার ভাঙবেন?

তিন দিন প্র্যাকটিসের পরই সুরজিৎ সেনগুপ্ত বলেছিলেন, "আকবরের যা ফর্ম দেখছি, আবার টপ স্কোরার হবে।" কথাটা আকবরের দাদা হাবিবের কানে পৌঁছল একটু অন্যভাবে। তিনি শুনলেন যে, সুরজিৎ বলেছেন এবার তিনি আকবরকে টপ স্কোরার করবেনই। মহামেডান-প্রিমিয়ার টায়ার্স ম্যাচের পর হাবিব সুভাষ ভৌমিককে বললেন, "সুরজিৎ নাকি এই রকম বলেছে। আকবর এবার খুব ভাল কন্ডিশনে আছে। হয়তো পারবে। তবে বুকের পাটা আছে সুরজিতের, আমিও তো কখনো এভাবে বলতে পারিনি।" আমার মুখে এই কথা শুনে সুরজিৎ বলেছেন,

---

॥ কলকাতার সংস্কৃতি ॥

আজব শহর এই কলকাতা। যে শহরে তোমরা জন্মেছো, বড় হচ্ছ, স্কুলে যাচ্ছ।

এ শহরের মাটিতে ইতিহাস। রাস্তার নামে নামে স্মরণীয় মানুষের বরণীয় স্মৃতি। তোমরা কি এসব কথা ভেবেছো কখনও?

ধর ভয়ানক এক ভিড়ের বাসে উঠছো। পা রাখতেই আপনজনের মত তোমায় হাত দিয়ে টেনে নিল যে মানুষটি, সে হয়তো জীবনে কোনদিন তোমার মুখও দেখে নি। কিংবা তুমি স্কুলে যাবার সময় কোন বৃদ্ধা কিংবা শিশুকে বাসের "সিট" টা ছেড়ে দিলে। এই যে অপরিচিতের জন্য মায়া এটাও কলকাতা শহরেরই বিশেষত্ব। কলকাতাবাসীর মানবিকতা।

আবার এই শহরের কত বৈচিত্র্য। রকমারি জিনিষপত্তর তো আছেই, শুধু বইয়ের কথাই ধর না। কলেজ ষ্ট্রীট পাড়ায় ছোট বড় মাঝারি মিশিয়ে শ'চারেক শুধু বই-এরই দোকান। পৃথিবীর আর কোথাও এক জায়গায়, একসঙ্গে এতগুলো পুঁথিঘর দেখতে পাবে না।

শহরটা বড় কিন্তু এখানে ছোট, বড়, মাঝারি সব শ্রেণীর মানুষেরই সহ-অবস্থান। এখানে যেমন আছে চৌরঙ্গী, বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুর। তেমনি আছে পেয়ারাবাগান, দারাপারার বস্তীগুলোও।

বড় বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বৈঠক, রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর, নামজাদা নাটক, কবি সম্মেলনও যেমন লেগে রয়েছে কলকাতায়, সেই সঙ্গে রয়েছে পরদেশী হোলির "রামাহো" ভজনও।

বহুদিন ধরে বহু মানুষের স্রোত এসে মিশেছে এই শহর কলকাতায়। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে কলকাতার। সেটা ভুলো না কিন্তু।

জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ হইতে প্রচারিত।

"আমি টপ স্কোরার বানাব কেন? চুয়াত্তরে এক টীমে খেলে আমি আর আকবর লীগে টপ স্কোরার হয়েছিলাম। আমি আর হইনি, কিন্তু আকবর টপ স্কোরার হয়েছে চারবার। একাত্তর থেকে আটাত্তর—এই আট বছরে যে চারবার টপ স্কোরার হয়েছে, অন্যের সহজ নিয়মে এই দশ বছরে সে যদি পঞ্চমবার টপ স্কোরার হয়, অবাক হওয়ার কী আছে?"

গোয়া থেকে এসেছেন ফ্রান্সিস ডিসুজা। একটি কাজেই গভীর মনোযোগী, গোল করা। ফেডারেশন কাপে প্রথম দুই ম্যাচে দুটি গোল পাবার পর ঝিমিয়ে গেলেন। ঝিমিয়ে-পড়া ফ্রান্সিস হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছেন। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে কী করবেন, কে বলতে পারে?

কিন্তু মিহির-মানস-সাম্বির- আকবর ফ্রান্সিসের সামনে হঠাৎ প্রথম দাঁড়িয়ে গেছেন একজন দুর্দান্ত ফুটবলার, যিনি টপ স্কোরার হতেই পারেন। বাসকার, বিসকার, বশকার বাকসার—মজিদের নামের উচ্চারণ নিয়ে নানা মত দেখা দিলেও, একটা ব্যাপারে সকলেই একমত—এই মুহূর্তে তিনি কলকাতার এক নম্বর স্ট্রাইকার। মিডফীল্ডার হিসেবেও সমান কার্যকরী এই ইরানী তরুণ প্রায় একাই এখন ইস্টবেঙ্গল আক্রমণকে গতির রথে চাঁড়য়ে-ছেন। তাঁর পায়ের কামান থেকে বেরিয়ে আসা কটি গোলা বিপক্ষের গোলজালে জড়াবে জানি না। তবে সফল গোলকীপারেরা বুঝবেন, হাতে যা এল তা গোলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

লেখা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। মজিদের পাশের ইরানী তরুণটিকে এমনিতে কেউ লক্ষ করে না, কিন্তু জালে বল পাঠিয়ে তিনি যখন টাচলাইনের দিকে দৌড়ে গিয়ে দু হাত তুলে নাচেন, তখন তো লক্ষ করতেই হয়। হ্যাঁ জামশিদ নাসিরি এবার ফেডারেশন কাপে পাঁচটি গোল করে টপ স্কোরার হয়েছেন। ফাইনালে সুব্রত ভট্টাচার্য তাঁকে প্রায় গিলেই ফেলেছিলেন। তবে কলকাতার সব টীমে তো আর সুব্রত ভট্টাচার্য নেই।

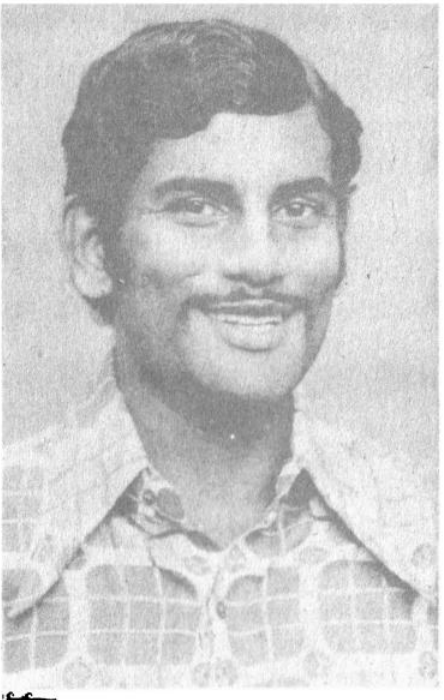

মিহির

আকবর

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

পুরুষদের সিঙ্গলস-বিজয়ী সি জিহাও

এশীয় টেবিল টেনিস

অলোক দাশগুপ্ত

তিরিশ ফুট লম্বা এবং বারো ফুট চওড়া হল-ঘর। প্রায় দেওয়াল ঘেঁষে দুই সারি ছোট-ছোট বেঞ্চ পাতা। কুড়ি এবং কুড়ি, মোট চল্লিশজন ছেলেমেয়ে মুখোমুখি বসে আছে। ওদের বয়স চার-পাঁচ, প্রত্যেকের হাতে পেন-হোল্ড গ্রীপে ধরা টেবিল টেনিস ব্যাট। ছাদের দেওয়াল থেকে সুতোয় বেঁধে কুড়িটা পিংপং বল ওদের সামনে ঝোলানো, একটি শিশু এদিক থেকে বলটাকে মারছে, আবার অন্যজন সেটাকে ফেরত পাঠাচ্ছে। এমনিভাবেই ছেলেবেলা থেকে ওদের টেবিল টেনিসে অনুরাগী করা হচ্ছে।

ওরই মধ্যে আবার দু-তিনজন কোচ ঘোরাফেরা করছেন। লক্ষ রাখছেন বড় খেলোয়াড় হওয়ার মতো সহজাত প্রবণতা কার-কার মধ্যে আছে। তাদের বেছে নিয়ে আলাদা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে, যাতে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন ছেলেবেলা থেকেই সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে।

দুই বছর আগে চীন সফরে একটি কিন্ডারগার্টেন পরিদর্শনের সময় এমনি অভিজ্ঞতা হয়েছিল ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের। কোচ দীপু ঘোষের মুখে এই ঘটনার কথা শুনেছি। তিনিই বললেন, পিংপং চীনে অসম্ভব জনপ্রিয় খেলা। এই ছোট্ট দৃষ্টান্ত থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না চীনাদের সাফল্যের উৎস কোথায়।

খেলা জনপ্রিয় হলে ভাল খেলোয়াড়ের সংখ্যাও বেশি হবে। তাই একজন খেলোয়াড় বেশি দিন নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেন না, অপর খেলোয়াড় তাঁর স্থান দখল করে নেন। আর তাই পাঁচ বছর আগে কলকাতায় তেত্রিশতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শি এন টিং, শু সাও-ফা, লিয়াং কো-লিয়াং, চ্যাং লি প্রভৃতি যে-সব খেলোয়াড়কে দেখা গিয়েছিল, তাঁদের কেউ-ই এবারের পঞ্চম এশীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেননি। এমন-কী এই প্রতিযোগিতার সেরা-বাছাই, বিশ্বের দুই নম্বর পুরুষ এবং মহিলা খেলোয়াড় চীনের গুয়ো উইয়ে হুয়া এবং উত্তর কোরিয়ার লি সং সুক (যাঁদের

মহিলাদের সিঙ্গলস-বিজয়িনী বাওজিয়াং

পুরুষদের সিঙ্গলস-ফাইনাল

ফলক-বিভাগে রানার-আপ সুজয়

সম্ভাব্য বিজয়ী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল) ফাইনালেও উঠতে পারেননি। পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন যথাক্রমে চীনের শি জিহাও এবং কী বাওজিয়াং, স্বদেশীয় জাই সাইকে এবং লিউ ইয়ংকে অপেক্ষাকৃত সহজেই এঁরা হারিয়ে দেন।

ফাইনালে সাইকে তেমন সুবিধা করতে পারেননি, কিন্তু এই প্রতিযোগিতার সেরা সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ১৮ বছরের এই চীনা যুবক। কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের দর্শকদের এক বিরাট অংশের ধারণা সাইকে ভবিষ্যতে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হবেন। ওঁর হাতে দারুণ মার আছে। সেমি-ফাইনালে শীর্ষ বাছাই গুয়োকে তো প্রায় দাঁড়াতেই দেননি—স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতেছেন, তবে ডিফেন্স তেমন মজবুত নয়। অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে সাইকে তাঁর ত্রুটিগুলিকে শুধরে নিতে পারবেন বলে মনে হয়।

যেমন আশা করা গিয়েছিল, চীন এবারের প্রতিযোগিতায় একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেছে। হয়তো যার জন্য ফাইনালের খেলাগুলি তেমন জমে ওঠেনি। পুরুষ এবং মহিলাদের দলগত খেতাব চীন অনায়াসে জিতেছে। একমাত্র বালক এবং বালিকা বিভাগে (যেখানে কোন চীনা প্রতিযোগী ছিল না) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হংকংয়ের ল কাম টুং এবং জাপানের ফুমিকো ওকোমটা, পুরুষদের ডাবলস খেতাব জিতেছেন সাইকে ও গুয়ো জিহাও ও জেন হুয়াকে হারিয়ে, মেয়েদের ডাবলস ফাইনালে যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চীনা জুটি লিউ ইয়াং ও জ্যাং ডাইং এবং উত্তর কোরীয় পাক ইয়ং ওক ও গিল সন, তাই ম্যাচটিতে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলেছিল। কিন্তু চীনা জুটিই ছিলেন দক্ষতর। ওঁরা স্ট্রেট সেটে ম্যাচটি জেতেন। মিকসড ডাবলসে আবার চীনাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই। জিতেছেন সাইকে ও জ্যাং ডাইং, গুয়ো ও লিউ ইয়ংকে হারিয়ে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনজন বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এঁরা হলেন

Imageads-NP-6k

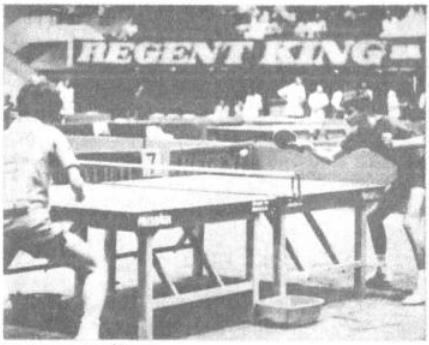

বালকদের ফাইনাল

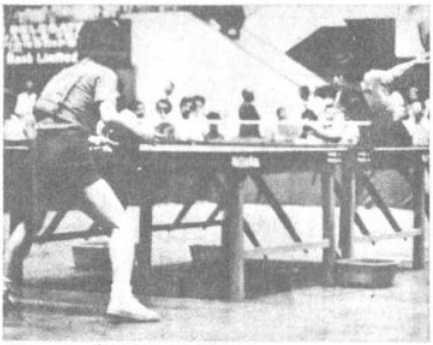
মহিলাদের সিঙ্গল্‌স-ফাইনাল

মনমিত সিং, সুজয় ঘোরপাড়ে এবং নিয়তি রায়। দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে মনমিত দারুণ খেলেছেন। চীন ছাড়া প্রায় সব দেশেরই মোটামুটি নামী খেলোয়াড়দের হারিয়েছেন। মূলত ওঁরই দক্ষতায় ভারতীয় পুরুষরা চীন, জাপান এবং উত্তর কোরিয়ার পরই স্থান করে নিতে পেরেছে। অবশ্য এ ব্যাপারে ভারতীয় দলের কোরীয় কোচও যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখেন।

সুজয় ঘোরপাড়ে একজন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়। বালক বিভাগে রানার-আপ হয়েছেন। ফাইনালে অতিরিক্ত স্নায়ুর চাপে না ভুগলে খেতাব জেতা অসম্ভব ছিল না। নিয়তি রায় বালিকা বিভাগে শেষ চারজনের মধ্যে স্থান করে নিতে পেরেছেন।

পঁচাত্তরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপকে ঘিরে কলকাতায় যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল, এবারের এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সেই উন্মাদনা কিন্তু দেখা যায়নি। সদ্য-সমাপ্ত ফেডারেশন কাপ ফুটবলের পরে টেবিল টেনিস সম্ভবত খেলা-পাগল কলকাতার মানুষকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। হয়তো চীনের সঙ্গে এশিয়ার অন্যান্য দেশের মানের অনেক তফাত এর একটি কারণ, তবে একটা কথা মানতেই হবে, সংগঠকরা টিকিটের দাম অত্যন্ত বেশি করেছিলেন। যার জন্য ফাইনালের দিনও ছয়-সাত হাজারের বেশি দর্শক নেতাজী স্টেডিয়ামে হাজির হননি।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

সাতশো বছর আগেকার কথা। চীনদেশের কিং-তে-চিন শহরের বিরাট এক কারখানা। একজন সাদা চামড়ার মানুষ সেখানে চীনেদের মধ্যে ঘুরঘুর করছে কেন? প্রশ্ন করছে সবাইকে, অনুনয়-বিনয় করছে। কী জানতে চায় সে? এসেছে সে ইতালি থেকে, নাম মার্কো পোলো। জানতে চায় ওই কারখানায় যে আশ্চর্য বস্তু তৈরি হয় তার অতি গোপন রহস্যটি। পোর্সেলিন। ইউরোপের বাজার মাত করেছে। যেমন মসৃণ, তেমনি সুকুমার এই অত্যাশ্চর্য চীনেমাটির বাসন-কোসন। কিন্তু হায় বেচারি মার্কো পোলো। কী দিয়ে পোর্সেলিন তৈরি হয় তার আসল রহস্য কেউ তো তার কাছে ফাঁস করলই না, বরং নানা আজগুবি কথা বলে তাকে নিয়ে মজা করতে লাগল। কেউ বলল, ডিম দিয়ে বানাতে হয় এ জিনিস। কিন্তু সে ডিম আগে একশো বছর মাটির নীচে পুঁতে রাখা চাই। মার্কো পোলো হতাশ হয়ে ফিরে এল। আরও প্রায় আড়াইশো বছর পোর্সেলিনের রহস্য ইউরোপের অজানাই থেকে গেল।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু

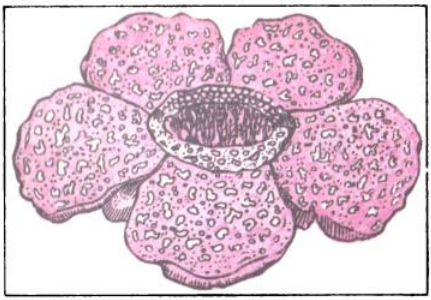

সবচেয়ে বড় ফুল

পার্থসারথি চক্রবর্তী

র‍্যাফ্লেশিয়া এক তাজ্জব ফুল। বছর দেড়েক লাগে এর কুঁড়ি থেকে সাজগোজ করে ফুল হয়ে ফুটতে। কিন্তু ফুটবার মাত্র দুদিনের মধ্যেই সব শেষ।

ফুলটির পুরো নাম র‍্যাফ্লেশিয়া আরনোলডি। নামের পেছনেও ইতিহাস আছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জাভার লেঃ গভর্নর স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফ্লেশ এবং বিশিষ্ট প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডঃ জোসেফ আরনোল্ড ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় এই অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য পরগাছাটি আবিষ্কার করেন। তাঁদের নামানুসারে প্রসিদ্ধ ইংরাজ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ রবার্ট ব্রাউন গাছটির ঐ নাম দেন।

এটা একটা পরগাছা। পরগাছা হচ্ছে সেই গাছ, যে পরের ঘাড়ে চেপে বেঁচে থাকে। কোনো কোনো পরগাছা আশ্রয়দাতা গাছের দেহ থেকে আংশিক খাদ্য নেয়, কেউ বা সম্পূর্ণটাই নেয়।

র‍্যাফ্লেশিয়ার সমস্ত গাছটাই ওর ফুল। এই পরগাছাটি যে গাছ বেয়ে ওঠে, তার শিকড়ে হয় এই ফুলের আবির্ভাব। উদ্ভিদ-জগতে এত বড় ফুল আর নেই। মুকুল থেকে ফুটবার সময় এর ব্যাস হয় প্রায় চৌত্রিশ মিটার এবং সম্পূর্ণ ফুটলে এটার পর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের মাপ প্রায় নব্বই মিটার! ওজনটাও কম নয়—প্রায় দশ কেজি, সাধারণত এর পাপড়ি হয় পাঁচটি এবং সেগুলি মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে। রঙ ইটের মতো লালচে, মাঝে-মাঝে গাঢ় বেগুনি।

এই পরগাছার সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার-স্যাপার দেখে জার্মানির এক উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদ একে 'পাগলা গাছ' বলে অভিহিত করেছেন।

মণিমেলার খবর

গ্রীষ্মের ছুটিতে মণিমেলা মহাকেন্দ্র পরিচালিত মণিপ্রতীক পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলে পরীক্ষার্থী-দের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৬ এপ্রিল আঞ্চলিক, জেলা প্রতিনিধি ও মহাকেন্দ্রর সচিবদের সমাবেশে বর্তমান বছরের জন্য কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং বিগত বছরের সমস্ত কাজের পর্যালোচনা হয়।

আঞ্চলিক সংবাদ

হুগলী জেলার মণিমেলা কেন্দ্রগুলি মহেশ উচ্চবিদ্যালয়ে বারো দিনের এক খো-খো শিক্ষাদানকেন্দ্র পরিচালনা করে। পশ্চিমবঙ্গ খো-খো সম্পাদক শ্রীপ্রণব রায়ের তত্ত্বাবধানে ৭৩ জন ভাইবোন শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রত্যেককে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।

শ্রীরামপুর অঞ্চলের মণি ভাইবোনরা সম্প্রতি শিক্ষাভ্রমণে গিয়েছিল।

সোনারপুর অঞ্চলের মণিমেলাগুলি সারদাময়ী মাতৃ-আশ্রমে এক প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।

বসিরহাট অঞ্চলের মণিমেলাগুলি চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ছোটদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সংস্কৃতি মণিমেলার অঙ্কুর সেন 'শ্রেষ্ঠ' বক্তার পুরস্কার পায়।

মণিসন্দেশ

বার্ষিক উৎসব পালিত হয় শান্তিকামী, মাতৃমন্দির, শিশুতীর্থ, গরিফা ও অনির্বাণ মণিমেলায়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নিউ তরুণ, কিংশুক ও অনির্বাণ মণিমেলায়। বনভোজন করে বৈশাখী ও অশোকনগর মণিমেলা। নবারুণ মণিমেলা সুন্দরবন ভ্রমণে যায়।

গরিফা মণিমেলা মৌমাছির ৭১তম জন্মদিন পালন করে বিরাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

চামেলির বিদেশী বন্ধু

প্রসাদ

শ্রীমতী চামেলী রায়কে তোমরা নেহাত সামান্য লোক মনে কোরো না, বিদেশ থেকে তার নামে চিঠি আসে। সত্যি বলছি! আমি নিজের চোখে দেখেছি! দেখে তো আমার একটু হিংসেই হচ্ছিল, দূরের চিঠি বলতে জামসেদপুর থেকে আমি মাঝে-মাঝে চিঠি পাই বটে, আর এ একেবারে স্কটল্যানড! ব্যাপারটা কী? চামেলির মুখ থেকেই শুনি :

I've a friend in Edinburgh, Scotland. Her name is Mary Mackay. We've never met, but she's one of my very best friends. She writes to me such nice letters. She's sent me pictures of herself and her family. She has a brother. His name is Ian. Mary is eight and Ian is five. Mary's father is a solicitor. A solicitor is a lawyer. Mary wants to be a nurse when she grows up. I don't want to be a nurse. I want to be a teacher.

তাই ভাবছিলাম সেদিন। কোথায় জামসেদপুর, আর কোথায় এডিনবরা!

Jamshedpur, no doubt, is at some distance from Calcutta.

But Edinburgh is at a very much greater distance.

It takes a few hours to travel from Calcutta to Jamshedpur.

A trip to Edinburgh takes much longer.

The train fare to Jamshedpur is only a few rupees.

A trip to Edinburgh costs a great deal more.

মিলিকে লেখা মেরির চিঠি পড়ে খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল যেতে। চিঠিটা মিলি আমাকে দেখিয়েছিল।

My dear Chameli,

Thank you for your letter of March 6. We must write to each other more often. And please write more about your school and your friends.

Here's more about Edinburgh.

It's a great city. London is longer and has bigger buildings, but I like Edinburgh more. It's our capital city. London is more famous because it's the capital of U. K.

I wish you could see our Princes Street. My father says it's one of the widest and most beautiful streets in the whole world. It has fine shops on one side and gardens on the other.

এরকম আরো কত কী লিখেছিল মেরি। আমরা এই কথাগুলো লক্ষ করি :

Edinburgh is a great city.

London is larger than Edinburgh.

Edinburgh is famous.

London is more famous than Edinburgh.

Princes Street is the widest and the most beautiful street in Edinburgh.

It's one of the widest and most beautiful streets in the world.

ভুল শুধরে নাও : ২৩ এপ্রিল সংখ্যার 'সহজে ইংরেজি'তে I pulled it too না-পড়ে I pulled it to পড়ো।

বাঘা

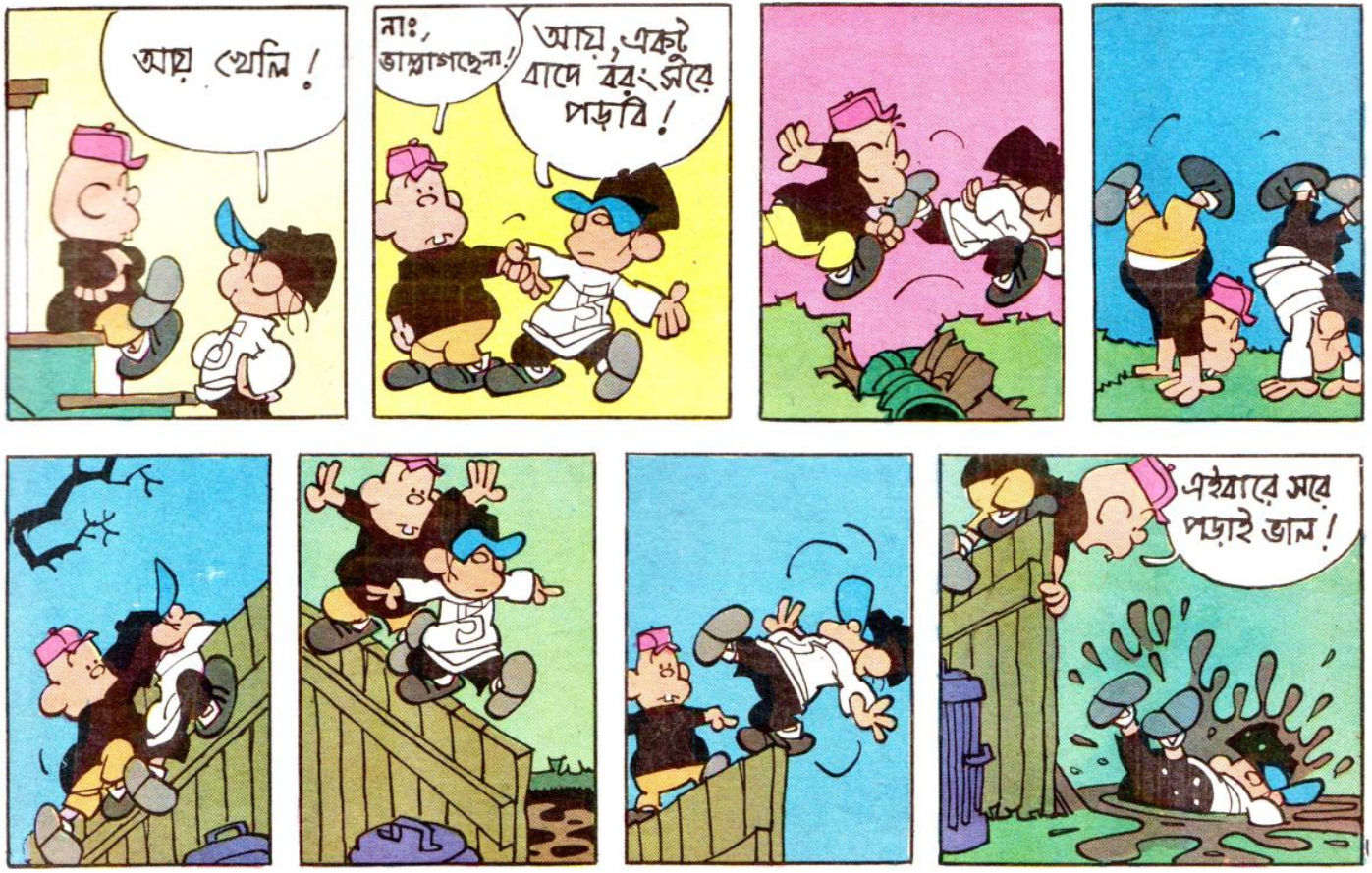

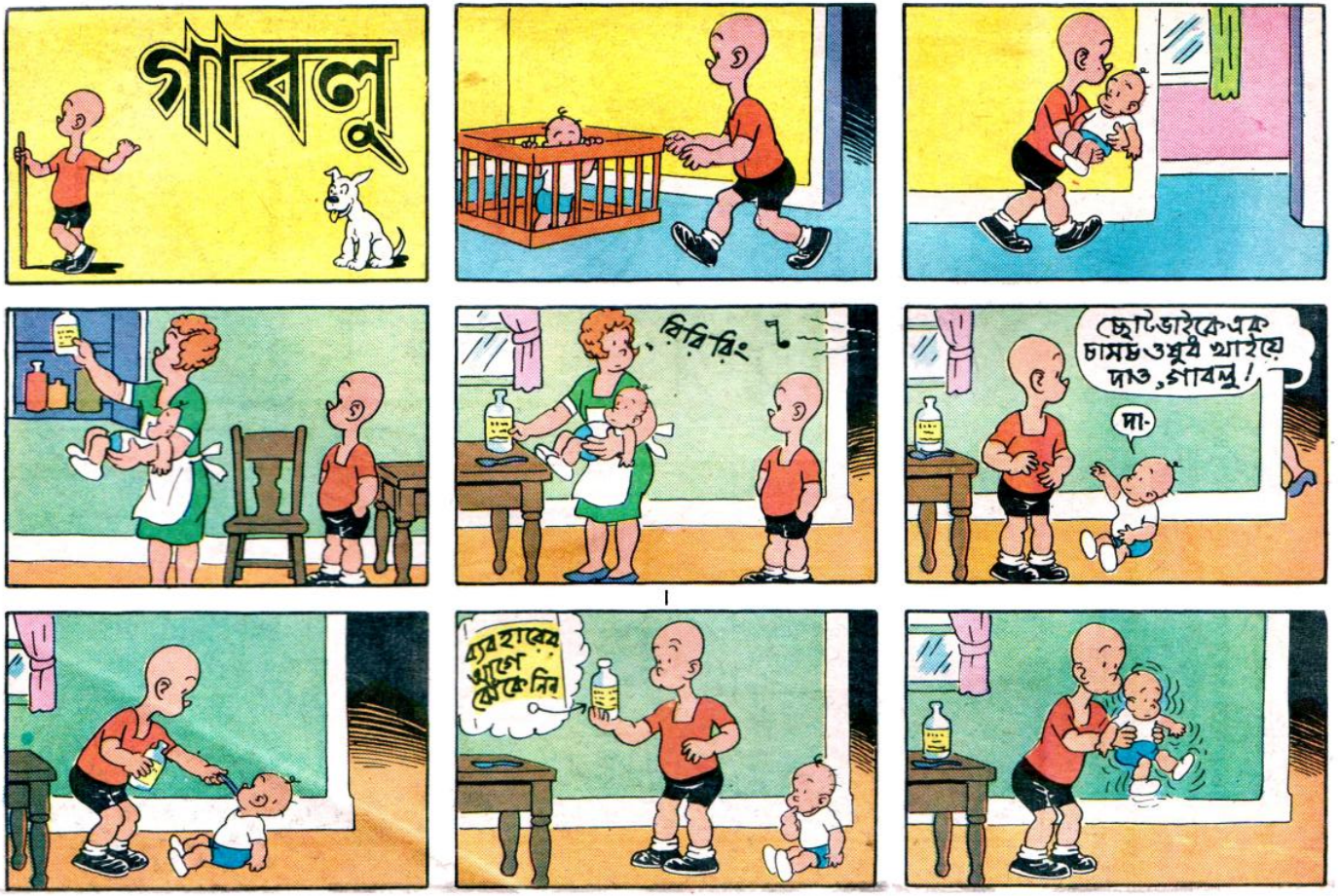

গাবলু
রিরিরিং
ছোটভাইকে এক চামচ ওষুধ খাইয়ে দাও, গাবলু!
দা-
ব্যবহারের আগে ঝেঁকে নিন

জন্তু-জানোয়ার ঃ গরুর পাল ২

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌকো দিয়ে গরুর পালের ছক পেলে। এবার সেই ছকগুলোকে গরুর বিশেষ অংশের চরিত্র অনুযায়ী যোগ দিলেই (লাল লাইন) দেখবে ঠিক ঠিক গরুগুলো জ্যান্ত হয়ে মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে। (নমুনা পাশে ঘুরিয়ে দ্যাখো)

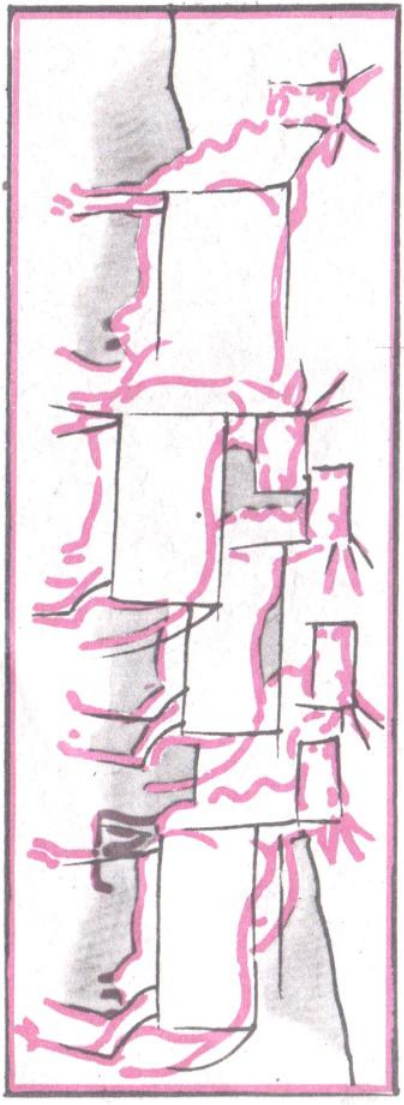

কাগজের খেলনা ঃ গোলবাহারি ঝাড় ২

কারিগর

নমুনা-মাফিক কাজের জন্যে আগেরবার দুটো সমান মাপের গোল কেটেছ, এবার তার সঙ্গে একই মাপের আর একটি যোগ করো। এবারের গোলে মাঝামাঝি দুদিকেই কেটে নাও (৫—৬ লক্ষ করো)।

এখন 'ক' গোলের ১—২ চিহ্নিত দিক ভাঁজ করে 'খ' গোলের ৩—৪ চিহ্নিত কাটা অংশের মধ্যে ঢুকিয়ে ভাঁজ খুলে দাও। আবার ঐ দুই গোলকে (ক+খ) ভাঁজ করে 'গ' গোলের ৫—৬ চিহ্নিত কাটা অংশে ঢুকিয়ে নিয়ে খুব সাবধানে সব ভাঁজ খুলে দিলেই তোমার বাহারি ঝাড় পাবে।

জেনে রাখো—(১) প্রত্যেকটি গোলের জন্য আলাদা আলাদা রং ব্যবহার করতে পারো। (২) কাজ শেষ হলে প্রয়োজনমতো সুতো বেঁধে ঘরে ঝুলিয়ে দেবে।

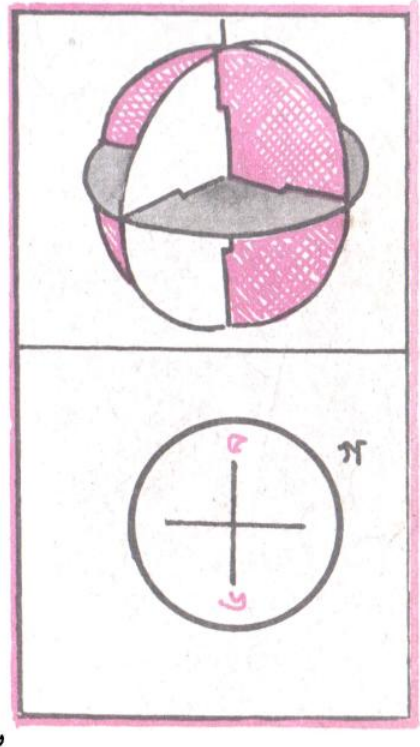

বেশির ভাগ মায়েরা
নিজেদের সন্তান পুষ্টিকর খাদ্য
খাচ্ছে কিনা সেবিষয়ে
চিন্তিত থাকেন।
কিন্তু সুচিত্রা তা' নন ...

"কারণ, আমি ওদের রোজই হরলিক্স খাওয়াই।
ডাক্তারবাবু যেদিন থেকে হরলিক্স সুপারিশ করেছেন,
আমি আমার ছেলেমেয়েদের হরলিক্স খাওয়া
প্রতিদিনের অভ্যাস করিয়ে নিয়েছি। আমি জানি,
হরলিক্স ওদের শক্তিসমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যবান রাখতে
সাহায্য করে।

আপনি আপনার ছেলেমেয়েদের
নিয়মিত হরলিক্স খাওয়ান তো?"

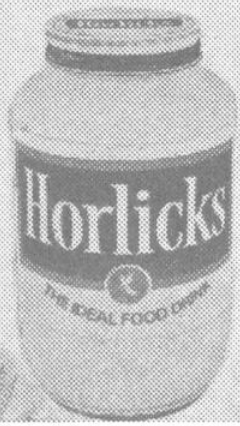

"হরলিক্স পুষ্টির একটি মূল উৎস। পুষ্টিকর খাদ্যের এক অপূর্ব্ব সামিশ্রণে তৈরী হরলিক্স স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি সর্বদাই হরলিক্স ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"

Hx-6282 Ben-2

হরলিক্স
মহান শক্তিদাতা

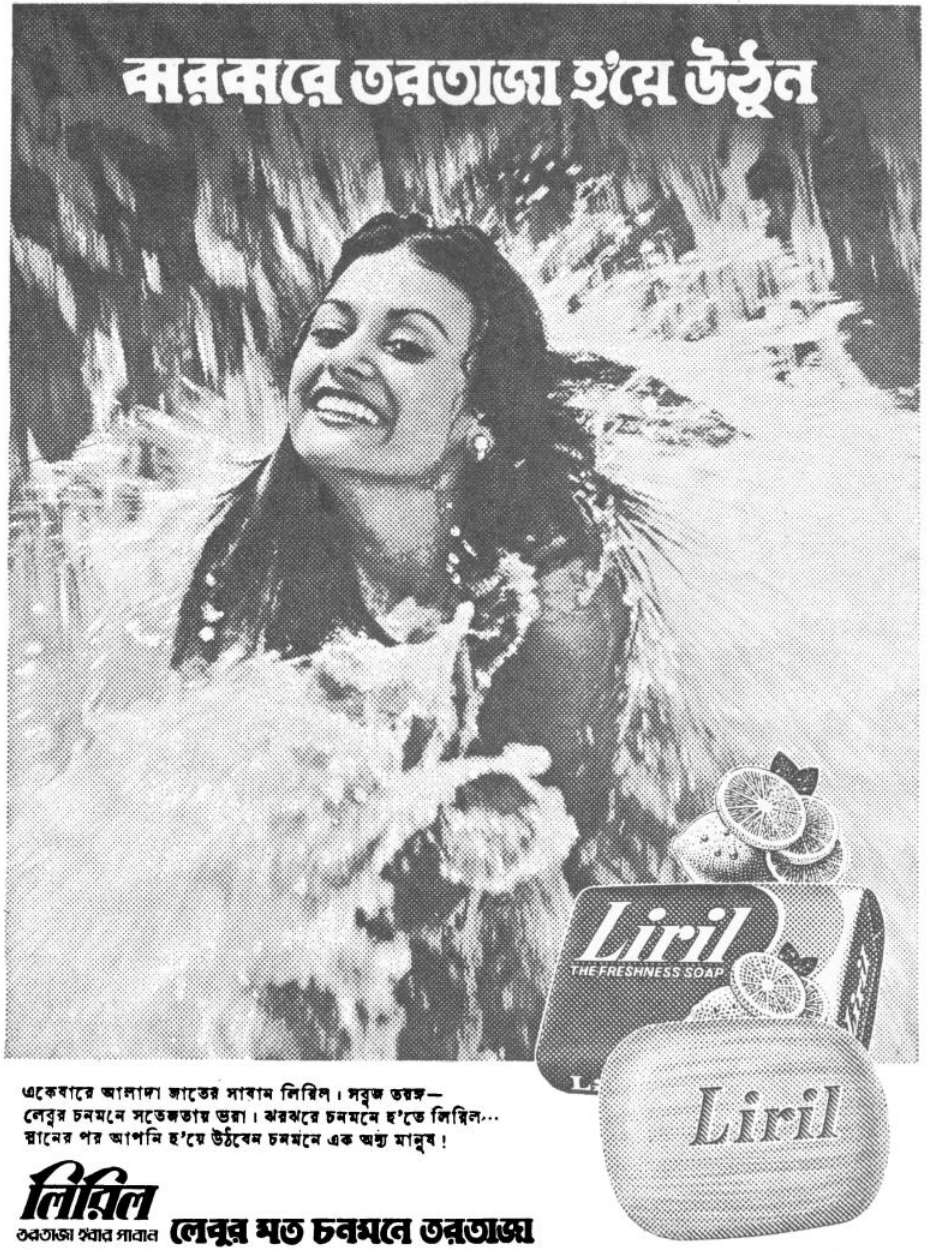

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল…
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা করার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা

লিনটাস-LR.27.203 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন